# মোহমায়া

# মোহমায়া

সমরেশ বসু

পরিবেশক

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

☐ প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ নববর্ষ ১৩৬৫, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৮

☐ প্রকাশক ঃ নিতাই দাস। অমৃতধারা, ৩৫/ডি, কৈলাস বসু স্ট্রীট ; কলি-৬

☐ মুদ্রাকর ঃ তারকনাথ পাল, দি সরস্বতী প্রেস, ১৪, চণ্ডীবাড়ি স্ট্রীট, কলি-৬

☐ প্রচ্ছদ ও স্কেচ ঃ অনূপ রায়।

আসল লোকের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। একে আসল লোক বলা যাবে কী না জানি না, কিন্তু এ লোকটি চালক। গাড়ির, মোটর গাড়ির চালক এবং মালিক। নাম ফকিরচাঁদ, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখন তার পরনে আছে একটা ময়লা ধুতিকে দু'ভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরা। গায়ে একটা বুকখোলা জামা, তার কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। ময়লা তো বটেই। বোতাম খোলা, বুকে একটা বেশ মোটা পৈতা দেখা যাচ্ছে। মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা, এখনো ভেজা-ভেজা। কিন্তু লক্ষ্য করলে চাঁদিতে খানিকটা তেল দেখা যাবে। গন্ধেও মালুম দেয়, সরষের তেলই মেখে চান করেছিল। কোনরকমে মোছার সময় হয়েছিল, আঁচড়াবার সময় হয় নি।

চেহারার মধ্যে এমনি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, চোখ-মুখ মন্দ নয়। চোখ দুটি কালো এবং ডাগর, নাকটাও চোখা। বেশ কয়েকদিন গোঁফ-দাড়ি কাটা না হলেও, মুখখানি যে খারাপ নয়, বোঝা যায়। কিন্তু মুখের ভাবভঙ্গি, চাউনিটা এমনই তাকালেই মনে হয়, লোকটা কাঠগোঁয়ার। যেভাবে বিড়িটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে, একপাশের দাঁত বের করে বিকৃত করে রেখেছে, যেন সে ওই দাঁত

দিয়ে সবকিছুই কামড়ে চিবিয়ে দিতে পারে। মুখের রঙটা একে সময় বোধহয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই ছিল। এখন জলে রোদে ভিজে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা বেশ তীক্ষ্ণ আর গভীর রেখা পড়েছে। শরীরের গঠনটা খারাপ নয়। তথাপি, একটু যেন বেশী লম্বাই মনে হয়। গায়ে গতরে একটু মাংস লাগলে বেশ ভালই দেখাবে। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, দেখায় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মত।

এর নাম ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস বর্ধমান কাটোয়া সাবডিভিশনের এক গ্রামে। কর্মস্থল হিসাবে সে বেছে নিয়েছে এই ফুলেরি ইষ্টিশন। এখানে যে-দুটি মোটর গাড়ি যাত্রী নিয়ে চলাচল করে, তার মধ্যে একটির মালিক এবং চালক সে নিজে। একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণচাঁপাগাছের ছায়ায় তার মোটর এখন বিশ্রাম করছে। হাল আমলের কোন গাড়ি নয়, সম্ভবতঃ ফকিরচাঁদের জন্মের আগে এই গাড়ির জন্ম হয়েছিল। গাড়ির দুপাশে পাদানি, যা নিচে বাঁশ দিয়ে, গাড়ির মাথায় দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তাতেই প্রমাণ করে গাড়িটার আমল বলে কিছু নেই আর এখন। গাড়ির দু পাশের দরজাই একেবারে আলাদা করে খোলা। গাছের গায়ে ঠেকনো দিয়ে রাখা হয়েছে। আগেকার দরজা নেই, দরজা বসাবার আলাদা লোহার ঘর কজা করা হয়েছে। আটকাবার জন্যে লোহার ছিটকিনি আছে। বনেট খোলা, একটা বাঁশের খুঁটি দিয়ে সেটা ঠেকা দিয়ে রেখেছে। ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে যে রকম গদি দেখা যায়, গাড়ির গদি সেই রকম। সামনের গদিতে একটি ছেলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ফকিরচাঁদ দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরে গাড়িটা দেখছে। এখনো বিড়িটা ধরানো হয়নি। হাতে দেশলাই, ধরাবার অবকাশ হয়নি এখনো।

খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখার পরে, ষ্টিয়ারিং হুইলটা একবার নাড়াচাড়া করে দেখল। তারপরে হঠাৎই যেন তার নজরে পড়ল, ছেলেটার মুখে মাথায় রোদ লাগছে। যেন ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে, ভুরু কুঁচকে, চোখ পাকিয়েই পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল। সূর্যটা সত্যিই এতখানি নেমে পড়েছে কি না, সেটাই তার জিজ্ঞাসু অনু-সন্ধিৎসা। তারপরে গাড়ির পিছন থেকে তেলকালি মাখার ওপরে যতটা সম্ভব পরিষ্কার থাকা এরকম একটা ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে ছেলেটির মুখ মাথা ঢেকে দিল। দাঁতে কামড়ানো বিড়িটা হাতে নিয়ে বারকয়েক টিপল, ঘোরালো, কানের কাছে নিয়ে তামাকের শুদ্ধতার শব্দ নিল। তারপর ধরালো। ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে উলটো পিঠ দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে ঢেঁকুর তুলল।

ঢেঁকুর তুলেই তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। কারুর উদ্দেশে একটা শ্রুতিকটু খিস্তি উচ্চারণ করে বলল,—'শালা রোজ এই ইঁদুর পচা তেল দিয়ে রেঁধে খাওয়াচ্ছে। পেটটাকে ইস্‌পয়েল করে দিল বানচত্।'

বলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে যেদিকে তাকাল, সেদিকেই ফুলেরির দোকানপাট, হাটবাজার। ফুলেরিকে প্রায় একটা গঞ্জবিশেষ বলা যায়। একটা বড় হাট আছে, সপ্তাহে দুদিন বসে। বেচাকেনার জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। তবে এখন আর হাটের অপেক্ষা নেই। আজকাল রোজই বাজার বসে। ফুলেরি এখন আর সে ফুলেরি নেই। রেল লাইনের এপারে ওপারে অনেক দোকান বেড়েছে। লাইনের ওপারে অদূরেই জি, টি, রোড। ফুলেরিতে ইস্কুল পোষ্ট-অফিস ছাড়াও বড বড় কয়েকটা ধানকল আছে। নতুন দুটো ঠাণ্ডা গুদাম হয়েছে, যার নাম কোল্ডষ্টোরেজ। আশেপাশে আরো আছে।

ধানচালের কারবারটা এখানে ভাল। আলু পেঁয়াজ কুমড়োও মন্দ নয়। এখন বার মাস নিত্যিদিন ব্যবসা। এখন রোজ বাজার বসবে বৈকি! লরির চলাচল বেড়েছে, জি,টি, রোড থেকে ফুলেরির মধ্যেও তাদের যাতায়াত। অতএব, মটর লরী মেরামতি কারখানা হয়েছে। সাইকেল রিকশাও প্রায় খান পনর-কুড়ি কোন না হবে। তাই খাবারের দোকান, ভাতের হোটেল, সবই বেড়েছে।

ফকিরচাঁদের যেটা বড় সুবিধে, ফুলেরি থেকে অনেক দিকে অনেক রাস্তা গিয়েছে। সোজাসুজি ফুলেরি থেকে না, জি, টি, রোড পড়লেই, যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাওয়া যাবে। আজকাল ভিতর দিকেও অনেক রাস্তা হয়েছে। তবে, পীচের রাস্তায় আর কদিন চলেছে ফকিরচাঁদের গাড়ি। গ্রামের রাস্তা, নয়তো ধান-কাটা মাঠের ওপরেই যাতায়াত বেশী। ফুলেরি ইষ্টিশনে যারা নামে, তারা কেউ শহরের যাত্রী নয়। সবাই দূর গাঁয়ের যাত্রী।

যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হাঁটা পথের যাত্রী। দূরের গ্রামের লোকেরা পরিবার পরিজন নিয়ে ফুলেরিতে আসবার আগে দেশে চিঠি পাঠিয়ে দিনক্ষণ জানিয়ে দেয়। গরুর গাড়ি এসে অপেক্ষা করে। নেহাত না হলে, সাইকেল রিকশায় সম্ভব হলে, তাতেই যায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি, মেঠো পথে রিকশা চলে না। আর মোটরগাড়ি নেহাত বিয়ে-থা অসুখ-বিসুখ এসব ব্যাপারেই লোকে খোঁজে। তাও পারতপক্ষে নয়।' আর যারা নেহাত গ্রামের মানুষ নয়, গরুর গাড়ি চড়তে অভ্যস্ত নয়, তারাই যা একটু-আধটু খোঁজ করে।

আগেকার দিনে যাও-বা নসীবপুর বা পুণ্যার হাটে রোজ কয়েকটা ক্ষেপ মারা যেত, আজকাল তাও উঠে গিয়েছে। আজকাল বাস এসে পড়েছে। লোকে আর শেয়ারে এই ছোট গাড়িতে উঠতে চায় না।

তবে হ্যাঁ, হাওয়া বইছে অন্যরকম। লোকে আজকাল গাড়ি চড়তে চায়। পকেটে একটু রেস্ত থাকলে আর বলা নেই, অমনি

গাড়ি। তাই বসে থাকতে হয় না প্রায় কোনদিনই। বরং রেট বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। নতুন জামাই মেয়ে দেখলে তো কথাই নেই। যা কিছু চেয়ে বস। যাবে তো ওঠ, তা নইলে যাও। তিন চাকা কতদূর নিয়ে যাবে। তাতে না হলে, মারো হনটন্।

'শালা বেশী রমজানি!' এ কথাও মনে মনে বলে ফকিরচাঁদ। কথায় কথায় মোটরগাড়ি যারা চড়তে চায়, তাদের ওপর কেমন একটা বিদ্বেষ আছে তার। অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ হয় সেটা বুঝি। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা চিরদিন গরুরগাড়িতে যাতায়াত করে এল, তুমি কোন খবর না দিয়ে, মোটরগাড়ি ভাড়া করবে। এ তো শুধু পয়সার জ্বলুনি না, ফুটানি, বাবু গাড়ি নিয়ে গাঁয়ে এলেন।

তবে, কার ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে। গাড়ি নিয়ে বসে আছে, ফ্যাল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? যে যত বেশী দেবে, সে-ই গাড়িতে উঠবে। এখন যখন তোমাদের বাতিক ধরেছে, তখন আক্কেল সেলামী দাও।

দোকানপাটের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফকির তার গাড়ির দিকে তাকাল। এখনো যা আছে মরা হাতির দাম লাখ টাকা। হতে পারে, দেশে অনেক গাড়ি হয়েছে, পাড়াগাঁয়ে এখানে সেখানে আজকাল হুট্ বলতে হাল ফ্যাশনের চকচকে ঝকঝকে গাড়ি যাতায়াত করছে। তা সে যতই গাড়ি বাড়ুক, যতই যাতায়াত করুক, ফুলেরিতে কেউ প্রাইভেট গাড়ির ব্যবসা করতে আসছে না। ফুলেরির প্রাইভেট গাড়ীর রাজত্ব দুই রাজ্যে ভাগাভাগী। দুই রাজ্যের দুজন রাজা। ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় আর কালী ঘোষাল।

নামটা মনে পড়তেই প্যাচ করে এক গাদা থুথু ফেলল ফকিরচাঁদ। দূরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, 'শালার সঙ্গে একদিন আমার হয়ে যাবে। বড্ড বাড়িয়েছে আজকাল।'

কথাটা নানান কারণেই ফকিরের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে।

মানুষের অনেকের অনেক রকম দোষ থাকতে পারে। নেশা-ভাঙ করতে পার তুমি। তোমার পয়সায় তুমি বিষ কিনে খাও গিয়ে, তাও আজকালকার দিনে কেউ দেখতে যাবে না। কিন্তু নেশা-ভাঙ্ করে লোকের ওপর হামলা করবে, এর তার ঘরের কথা নিয়ে, চরিত্রের কথা নিয়ে হাঁকডাক চেঁচামেচি করবে, তা চলবে না। কালী ঘোষালের এই দোষটি ষোলআনা।

'তোমার কেচ্ছা কে গায় তার নেই ঠিক, তুমি যাও পরের ছেঁদা খুঁজতে, শালা'···

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ফেলে, আর একবার থুথু ফেলল সে। নিচু হয়ে মাডগার্ডের তলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। তার মুখ দেখে মনে হল, গাড়ির কোন গোলমাল নেই।

'আর মেয়েমানুষ নিয়ে র‍্যালা কর, তা ও কারুর মাথাব্যথা নেই। রেস্তই বল আর রংই বল, মাগী পোট খেলে লেগে যাবে, কার কী। তা বলে অন্যের মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি করবে কেন? শালার সঙ্গে একদিন রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে।'

প্রায় বিড়বিড় করে কথাগুলো উচ্চারণ করল ফকির। কালী ঘোষাল, তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী এ সব বিষয়গুলো লোকটার ব্যাপারে সত্যি। মদ খেলেই সে দিগ্বিজয়ী রাজা। ফুলেরির হাটে গঞ্জে সবাই জানতে পারে, কালী মদ খেয়েছে। মেয়েমানুষের ব্যাপারেও তার নীতি প্রায় বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যদিও, ফুলেরি এমন একটা জায়গা এখানে কোন বেশ্যালয় নেই। শহরে যেমন পাকাপোক্ত পাড়া থাকে ফুলেরি সেরকম শহর নয় যে বরাবরের মত চালু কোন মেয়েমানুষদের ব্যবসা করার পাড়া থাকবে।

তবে হাটগঞ্জের ব্যাপার, এখনে সবরকম মানুষের আনাগোনা। দায়ে পড়ে খারাপ আর স্বভাবের দোষে খারাপ, এরকম মেয়ে যারা আশেপাশে আছে, তারা ফুলেরির কারবারে আছে। যেমন গদাধরের

বউ। গদাধরের কারবার হচ্ছে, বে-আইনী চোলাই মদের। স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই কারবার। দু'জনে মিলে চোলাই করে, দু'জনেই বিক্রী করে। এই করতে করতেই গদাধরের কালোচুলো আঁটো-খাটো বউটি নিজেকেও বিক্রী করে দিয়েছে। এখন সবাই জানে, গদাধরের বউ ফুলেরির রাঁড়। কিন্তু ফকির কোনদিন গদাধরের বউয়ের কাছে যায় নি। গদাধর বাউরি, বউও তার বাউরি, সেজন্য নয়। তার ভালই লাগে না। তবে হ্যাঁ, বউটার হাতের গুণ আছে, বস্তুটি ভালই বানায়। সেটা আনতে যেতে হয়। আর কালী ঘোষালকে গিয়ে দেখ। সে থাকলে গদার বউয়ের কাছে কুকুর এগুবার উপায় নেই! গদার বউ যদি বলে, 'তুমি ডেরাইভার এমন কর কেন বল তো। কই, ফকিরবাবু তো কখনো তোমার মত করে না।'

তার জবাবে কালী ঘোষাল বলে, 'আরে কালী ঘোষাল যেখানে আছে সেখানে ফক্‌রে চাটুয্যের মুরোদে না কুলোবে এগোতে।'

সব কথাতে ফক্‌রে চাটুয্যে। মনে মনে বলে, 'দেব একদিন এমন বাঁশ, ফক্‌রের পেছনে লাগা বেরিয়ে যাবে।'

গদার বউ ছাড়াও হাটে-বাজারে বেচা কেনা করতে আসে, এমন অনেক মেয়ে আছে। শনিবারের দিনটাই সব থেকে জম-জমাট। সেইদিন অনেক রাত অবধি বেচাকেনা চলে। সব রকমের বেচা-কেনাই চলে। বাজারের পেছনে, কোঙারদের দীঘির চারপাসেই, অন্ধকারে বৃন্দাবনলীলা হয়। যত তাড়ি মদের শ্রাদ্ধ, তেমনি ছুঁড়ি বুড়িরও শ্রাদ্ধ।

আশেপাশে ধানকল আছে কয়েকটা। সেখানকার কামিনগুলো আছে। চাষ-আবাদের কাজের জন্য সাঁওতাল মুণ্ডা মেয়েরা আছে। নন্দ পোদের ইঁট পোড়াবার কলেও মেয়ে কম নেই। সন্ধার সময় তাড়ির দোকানটা এদের দখলেই থাকে বলতে গেলে। তবে হ্যাঁ, এদের কাছে একটা জিনিস, বেবুশ্যেবৃত্তি পাবে না। এরা সোজাসুজি

মানুষ। তোমার সঙ্গে রঙ ধরল ভিড়ে পড়ল। গতরে খাটি, নিজের রোজগারে খাই। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। চল একটু আশনাই করি। পকেটের টাকা ঝনঝনিয়ে লোভ দেখাবে, সেটি হচ্ছে না। সে সব হল গদার বউয়ের মত মেয়ে। গদার বউয়ের সঙ্গে যে সব মেয়েদের ভাব ভালবাসা আছে, আশপাশের গ্রাম থেকে যারা যারা আসে, তারাও এসব করে। ভাল চরিত্রের মেয়ে তারা। তাদের কারুর অভাব কারুর স্বভাব। ফুলেরিতে যদি কোনদিন নিয়মিত মেয়ে পাড়া হয়, তবে তা গদাধরের বাড়িটাকে ঘিরেই হবে।

ফকির একটা ন্যাক্ড়া নিয়ে গাছতালয় খুলে রাখা গাড়ির দরজাগুলোর ধুলো ঝাড়তে লাগল উটকো হয়ে বসে। সে নিজে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। দোষ-ত্রুটি মানুষ মাত্রেরই আছে। তারপরে এ যা লাইন, কখন কোথায় যাচ্ছ, থাকছ, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ কি রকম আয় হবে, কাল পেটের ভাত জুটবে কি না এই ধান্দায় দিন কাটে। তাই জীবনটা আর মনটাও বেঠিক মত হয়ে গিয়েছে। চোখের মাঝে মধ্যে নেশা ধরে যায় বৈকি, রক্তে দপ্‌দপ্‌। তখন কিছু একটা ঘটে যায় হয়তো।

কিন্তু কালী ঘোষাল জানলেই পেছনে লাগবে। হাসি-টিটকারি হল্লা করে সবাইকে জানাবে। এটা কি লোক জানাবার মত বিষয়? কালীর মত ফকির অত বুক বাজিয়ে কিছু করতে চায় না। এতে বাহাদুরির কি আছে। কালী তা করবেই। শুধু তাই নাকি? ফকির যদি কোন মেয়ের সঙ্গে মেশে, কালী তার পেছনে ঘুর ঘুর করবে। একে তো, সকলের সামনেই বলে, 'চাটুয্যে, ধানকলের সেই ছুঁড়িটাকে বেশ জুটিয়েছিল!'

ফকির দু-এক কথা বলে কোনরকমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। দাঁতে দাঁত পিষে কাছ থেকে চলে যায়। তারপরে সে যখন

লোকজনকে বলে, জবাগাঁয়ে মুকুজেদের জামাই ফক্‌রে চাটুয্যে ধানকলের মেয়ে নিয়ে খুব উড়ছে।'

কেন, এসব শ্বশুর-জামাই কথা বলবার দরকার কী। ফকির কোন গ্রামের, কাদের বাড়ির জামাই, এসব কথা বলবার কী অধিকার কালীর। এ সব পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবার লোক ফকির নয়? আসলে খোঁচাটা যে কোথায় দিতে চায় সেটা ফকির ভালই জানে। এ জন্যেই কালী ঘোষালের সঙ্গে তার একদিন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

যেন কালী ঘোষালেরই গায়ে মারছে, এমনি ভাবে গাড়ির খোলা দরজাটাতে সে ন্যাকড়া দিয়ে জোরে জোরে ঝাপটা মারে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'শালা।'

এমন সময় তার নজর পড়ে গেল গাড়িটার ওপর। ছেলেটা মুখ থেকে তেল মোছা ন্যাকড়াটা সরিয়ে দিয়েছে। আবার রোদ পড়েছে তার মুখের ওপর। ফকির আবার একবার পশ্চিমের আকাশে তাকাল। সূর্যের এত তেজ যেন তার ভাল লাগছে না। সে এবার আর ন্যাকড়া ঢাকা দেবার চেষ্টা না করে দরজা তুলে নিয়েই কব্জায় বসিয়ে আটকে দিল। ছেলেটার মুখে এবার ছায়া পড়ল। ফকির, ছেলেটির গলার কাছ থেকে ন্যাকড়াটা নিয়ে গাড়ির পিছনের গদীতে ছুঁড়ে দিল।

ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাবার মুখে আবার সে ছেলেটার দিকে তাকাল। বুক খোলা জামার ফাঁকে ময়লা পৈতাগাছাটি দেখা যাচ্ছে, গত বছরই কোন-রকমে উপনয়নটা সারা গিয়েছে। মনে হতেই, ঠোঁট দুটো একবার বেঁকে উঠল ফকিরের। উপনয়ন! দ্বিজত্ব! নেহাৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে, তাই একটা নিয়ম-কার্য রক্ষা। এ ছেলে পুরোহিতবৃত্তিও করবে না, পণ্ডিতও হবে না। এর এখন একমাত্র পরিচয় ক্লিনার। ফকিরের গাড়ির সে ক্লিনার। তবে বলতে নেই, এই রোগা রোগা

হাত-পা নিয়ে গাড়ি চালাতেও শিখেছে।

বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলে। ইস্কুলেই পড়েছিল গ্রামের বাড়িতে। বুড়ি ঠাকুমাটি মরল, তারপরে ফকিরকেই সঙ্গে নিয়ে আসতে হল। দেখবার শোনবার কেউ নেই। দেশের বাড়িতে খাবার সংস্থান এমনিতেই ছিল না। ফকিরের আয়ের উপরেই সব। প্রকাণ্ড একটা বসত বাড়ি আছে। বিঘে পাঁচ ছয়েকের মত ধান জমি। দেখাশোনা করবারে লোকও নেই। তাই ফুলেরিতেই নিয়ে এসেছিল।

নিজের ছেলে, রেখে আসবেই বা কার ভরসায়। এককালে চাটুয্যেদের নাম-ডাক ছিল। সেই নাম-ডাকের ইঞ্জিনের যত গর্জন, তার বেবাক তেল বাবা পিতামহরাই শেষ করে গিয়েছে। ফকিরদের জন্য কিছু নেই। নিজের কৈশোরে তার একটু রোশনাই দেখেছিল। সেটা হল, দপ্ করে নিভে যাবার পূর্বাবস্থা। যৌবনে পা দিল, তারপবেই সব ফুত। নেহাত সাতকড়ি চাটুয্যের ছেলে বলে জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের মেয়ের আগমন ঘটেছিল। তাও যদি, মুকুজ্জেরা চাটুয্যেদের ভিতরের অবস্থা জানতো, তা হলে কখনোই সে বিয়ে হত না। আর এই একটিমাত্র কারণে নিজের বাপের বিরুদ্ধে ফকির নালিশ না করে পারল না। নেহাত বাপ, আর মানুষটা মারাও গিয়েছে, তা না হলে এখন এক এক সময় অকথা গালাগালি দিতে ইচ্ছে করে।

ভাবতেই ফকিরের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। কেউ দেখলে ভাবত, সে বুঝি ক্রুদ্ধ মুখে, জ্বলন্ত চোখে, ছেলেটার ঘুমন্ত মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। আসলে, তার নিজের বিয়ের কথাটাই মনে পড়ছে। কে বলেছিল বাবাকে, জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে? এখন যে কাঁচকলাটি দেখাচ্ছে সেটি দেখবে কে?

তবে হ্যাঁ, ফকির চাটুয্যেও চাটুয্যের বাচ্ছা। জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের মুখে সে ইয়ে করে দেয়। এত বড় সাহস তার শ্বশুরের, বলে কি না, লেখাপড়া শেখনি। তোমাদের অবস্থা যে এত খারাপ, তাও তোমার বাপ গোপনে করেছিল। তা নইলে অমন বাড়িতে কেউ মেয়ে দেয়? গোটা বাড়িতে হিসাব করলে, দু লাখ নোনা ইঁট ছাড়া তো কিছু নেই। তারও খদ্দের জুটবে না। তা যাই হোক মেয়ে যখন একবার সম্প্রদান হয়ে গেছে তখন তো আর চারা নেই। তুমি বরং আমাদের বাড়িতে এসেই থাক। মেয়েটাও খেয়ে পরে বাঁচবে। তোমারও আমার ওখানেই যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নেহাত শ্বশুরের নিজের বাড়িতে বসে বসে কথা হয়েছিল, নইলে লোকটাকে সে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিত। ফকির বলেছিল, 'সংসারে কি গরীব নেই?'

শ্বশুর বলেছিল, 'তা থাকবে না কেন। গরীবেরা গরীবের মত থাকে। তোমার জন্য তো ভাবনা নেই, মেয়ের জন্যেই ভাবনা। সে তোমাদের ওই পোড়ো বাড়িটায় উপোস দিয়ে থাকবে কি করে বল তো।'

সত্যি বলতে কি, অভাবের জন্য এমন অপমানিত ফকির সেই দিনের আগে আর তেমন করে হয়নি। বলেছিল, 'তা হলে অমন বাড়িতে মেয়ের বিয়ে না দিলেই পারতেন?'

শ্বশুর বলেছিল, 'গুরুজনের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, তাও বুঝি জান না। তোমার বাপ যদি কথা না বলত, তা হলে কি ও বাড়িতে মেয়ে দিই?'

'কেন আমার বাবা কি আপনাকে বলেছিল নাকি, আমাদের লাখ লাখ টাকা আছে?'

'তা বলে নি। তবে এ কথা বলেছিল, তালপুকুরে এখনো

নাকি ঘটি ডোবে।'

তখন ফকির বলেছিল, 'দেখুন ওসব বাপ খুড়ো কী বলেছে জানি না। আমি আমিই। আমি আপনার বাড়িতে বরাবর থাকব, এ কোনোদিন হবে না। আপনার মেয়ে থাকুক, তাও আমি চাই না। তারপরে যদি আপনার মেয়ে না যেতে চায়, সেটা তার ইচ্ছে।'

এ-সব বিষয়ে কথা হয়েছিল এই ছেলের জন্মের পরে। বিয়ের কয়েক মাস পরেই এ ছেলে মায়ের পেটে এসেছিল। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফকিরের মুখটি শুধু নরম হয়ে উঠল না, অসহায় পিতা করুণ চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কী করবে ফকির, ছেলেটার ভাগ্য। নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেনি। বাপ-ঠাকুর্দারও সেই ঢিলে-ঢালা সেকালের এক ধরনের আয়েসি চরিত্র ছিল। লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এমন একট প্রবণতা তাদের পরিবারের কোনদিনই ছিল না। নিজেরাও শেখেনি খেয়ে-পরে দিন চলে গিয়েছে। ভেবেছিল ফকিরদেরও চলে যাবে যা দিয়ে যাবে, তা তো নিজেরাই বেচারাম হয়ে বেচে দিয়ে গিয়েছে ছবিঘে জমিতে কখনো চলে। বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত জমি বিক্রি করে করতে হয়েছে। ফকিরের বিয়েতেও জমি বিক্রি করা হয়েছিল নেহাত এই জেলার জমির দাম সব থেকে বেশী। এই জেলার তুল জমি রাঢ়ে নেই বললেই চলে। অন্য জেলায় হলে এক হাত জমি থাকত না।

বিয়ের পরে যখন ছেলে হয়েছিল, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকত পারেনি ফকির। কাটোয়ার মহাদেব ঘোষ এই গাড়িটা চালাত। তা সঙ্গে গিয়ে চালানো শিখেছিল সে। চালানো, কিছু মেরামত সব শিখেছিল। ওদিকে মহাদেবের বয়সও হয়ে আসছিল। তার বদে

ফকিরই গাড়ি ট্রিপ দিত এখানে সেখানে। তারপর একদিন মহাদেব বলেছিল, সে আর গাড়ি চালাতে পারবে না। শরীরে কুলোচ্ছে না। ফকির যদি ইচ্ছে করে, সে-ই গাড়িটা কিনে নিক। সদরে গিয়ে নিজের নামে একটা লাইসেন্স করিয়ে নিলেই হবে।

সেই থেকে ফকির পুরোপুরি ড্রাইভার! মহাদেব মতলব দিয়ে গিয়েছিল, এ গাড়ি নিয়ে কাটোয়ায় বেশী দিন চালানো যাবে না। তার চেয়ে ফকির যেন ফুলেরির মত জায়গায় চলে যায়। সেখানে গাড়ির কারবার ভাল চলবে। উঠতি জায়গা, চট করে ওখানে কেউ যাবে না।

কথাটা মিথ্যে বলেনি মহাদেব ঘোষ। পুরনো লোক অনেক জায়গা দেখাশোনা ছিল। এসব গাড়ি কোথায় চলবে, দুটো পয়সা রোজগার হবে, ভাল বুঝত। ফুলেরিতে যখন প্রথম এসেছিল ফকির তখন কালী ঘোষাল এসে গাড়ির রাজ্যে ভাগ বসায় নি, ফুলেরিতে মোটরগাড়ির অধিপতি তখন একলা ফকির। কিন্তু এসব রাজ্যের কোন লেখাপড়া তো নেই ছ মাস না যেতেই কালী ঘোষাল এসেছিল। আরো দু-চারটে যদি আসে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু তাতেই কি দিন চলছিল। ছ বিঘা জমি, ভাগে চাষ। আধাআধি বখরা। তিরিশ, বড় জোর চল্লিশ মণ ধান বছরে পাওয়া যায়। ভাঙানোর খরচ খরচা আছে। তার থেকে কিছু বিক্রী বাটাও আছে। তা নইলে চলে না। এদিকে তার নিজের গাড়ির আয়। গাড়িটা পাঁচশো টাকায় মহাদেব দিয়েছিল। আরো শ তিনেক খরচ করে, এক রকম দাঁড় করিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তেল মবিল আছে। টায়ার টিউব আছে। নেহাত সেকালের গাড়ি, তা-ই এঞ্জিনটা এখনো চলে। আর তো সবই বেঁধে ছেঁদে চলে। আজ এটা ভাঙে, কাল ওটা খুলে কোথায় পড়ে যায়। বর্ধমান শহরের

স্বরীন মিস্তিরির কাছে তো দেনার অন্ত নেই। গাড়ির রোগ ধরলে তার ঘরেই সারানো হয়। পার্টসের দরকার হলে সে-ই দেয়।

তবু গাড়ি চালানোর টাকাই বাড়িতে পাঠাত। যখন যা পারত, তাই পাঠাত। রাতে সব মিলিয়ে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি, দিন গুজরানো চলছিল। অভাব চূড়ান্ত। গাইগরু ছিল না। ছেলেটার দুধের জন্যেও টাকা দরকার ছিল।

ছেলের যখন পাঁচ বছর, সে সময়েই একবার শেষ গিয়েছিল ফকির জবাগ্রামে। সেইবারেই শ্বশুরের সঙ্গে তার বিবাদ হয়েছিল। জবাগ্রামের মুখুজ্জেদের ঘরেও যে সরস্বতীর দয়া ছিল, তা নয়। তবে লক্ষ্মীর কৃপা ছিল। জমিজমা ভালই আছে। বাড়ি ঘরদোরও পাকা। শ্বশুরের তেজারতি বন্ধকি কারবার বেশ তেজী। টাকার জোরেই ভদ্রলোক।

তার কথা শুনে শ্বশুর বলেছিল, 'একখানা ছ্যাকরা গাড়ি চালিয়ে তো খাও। তাও সে গাড়ি দেখলে লজ্জা করে, ড্রইভারকে দেখলে আরো লজ্জা করে। তোমার অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তো ভাল নয় বাপু।'

কথাগুলো শ্বশুর বেশ ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা ভাবেই বলেছিল। এ সব লোক মোক্ষম কথা বলে, কিন্তু সহজে মাথাগরম করে না, গলা চড়ায় না। কিন্তু ফকির চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'বাড়িতে বসে অপমান করছেন?'

'কেন, বাইরে গেলে শোধ নেবে?' শ্বশুর হেসে বলেছিল, 'যা সত্যি তা বললে কি অপমান হয়?'

ফকিরের তখন যাচাই বিচারের মেজাজ ছিল না। বলেছিল, 'গাড়ি আর ড্রাইভার দেখলে আপনার লজ্জা করতে পারে, আপনাকে তো কোনদিন পায়ে ধরে সেধে সে গাড়িতে উঠতে বলি নি। আপনার লজ্জা নিয়ে আপনি থাকুন, আমাকে বলবেন না।'

'তবে কাকে বলব বাছা? গাড়ি তোমার, চালাও তুমি। তুমি পায়েধরে সাধলেই কি আমিও গাড়িতে উঠব? আমি ম'লেও গাড়িতে চেপে ত্রিবেণীতেও যাব না।'

অর্থাৎ শ্বশুর মারা গেলে ত্রিবেণীর চিতায় তার দাহ হবে। বোধহয় সেটাই তার ইচ্ছা। ফকির বলেছিল, 'আপনাকে ত্রিবেণী নিয়ে যাবার জন্য আমার বাড়ির দায় কেঁদে গেছে।'

টাকাউয়ালা লোকদের মেজাজে কতগুলো বৈচিত্র আছে। ওরা পরের দুঃখ নিয়ে বেশ মোলায়েম করে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারে। দু-চারটে কড়া কথা শুনেও তাদের তেলতেলে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। দুঃখী দরিদ্রের কটু কড়া কথার মধ্যে তারা একটা আনন্দদায়ক কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু এমন কোন কোন কথা আছে যে, সে কথা আর তেলতেলে গায়ে লাগে না। একেবারে ভিতরে গিয়ে বেঁধে। তখন সেটাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

ফকিরের শ্বশুরও পারে নি। শেষের কথাটি বেশ জোরেই বিঁধেছিল। তাই হঠাৎ একবারে চিৎকার করে উঠেছিল, 'থাম হে ছোকরা, তোমার মত অমন বাটপাড়ের ছেলে, পচা ড্রাইভার অনেক দেখেছি। বড় বড় কথা! শ্বশুরের সামনে কী ভাবে কথা বলতে হয় জান না? না জান তো হাঁটা দাও।'

পরিষ্কার তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ফকিরেরও তখন মাথার ঠিক ছিল না। সেও গলা তুলে বলেছিল, 'বাড়িতে পেয়ে অনেকেই অমন অপমান করতে পারে। আমার বাবাকে যে বাটপাড় বলে, তাকে আমি বলি চোর।'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বল।'

শ্বশুরের চিৎকারে তখন বাড়ির লোকজন বাইরের ঘরের দরজায় এসে পড়েছিল। কাজে কর্মে রত কিষাণরা, বাড়ির মেয়েরা।

ফকিরও তেমনি চিৎকার করে বলেছিল, 'কিসের মুখ সামলে মশায়? চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে বাড়িতে অপমান করছেন। আপনার বাড়িতে ফকির চাটুয্যে কোনদিন পেচ্ছাব করতেও আসবে না।'

'তবে রে ছোটলোক ইতর। বিশে, আমার বন্দুকটা নিয়ে আয় তো, এ ব্যাটার খুলি উড়িয়ে ছাড়ব আজ।'

শ্বশুর লাফিয়ে উঠেছিল কোমরের চাবি গুঁজতে গুঁজতে। ইতিমধ্যে ফকিরের এক শালা এসে পড়েছিল। শ্বাশুড়ি, তার বউ, সবাই। সকলেই শ্বশুরকে ঘিরে ধরেছিল। ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছিল। ফকিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তার বউ। ভয়ে তখন তার চোখে জল এসে পড়েছিল। বলেছিল, 'তুমি চুপ কর, পায়ে পড়ি। বাবা যদি দুটো কথা বলেই, তাতে কী হয়েছে?'

ফকিরের তখন উগ্রচণ্ডী মূর্তি। বলেছিল, 'দুটো কথা! একে দুটো কথা বলে? আমার বাবা বাটপাড়, আমি পচা ড্রাইভার, ছোটলোক, ইতর? আবার বন্দুক দেখাচ্ছেন। আমাকে বলে ঘরজামাই থাকতে। বলে, হাঁটা দাও।'

শ্বশুরের সমান চিৎকার, 'ঘরজামাই না, বাড়ির কিষেণ করে রাখব। আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি বলে জানব, তবু সে আর তোমার বাড়ি যাবে না।'

ফকির বলেছিল, 'এখন আর যাব না বললে তো আর একটা বড়লোক জামাই করা যাবে না।'

ফকিরের বউ সুষমা কাকে যে সামলাবে ঠিক করতে পারছিল না। তবু সে স্বামীকেই সামলাবার চেষ্টা করেছিল। ফকিরের পাঁচ বছরের ছেলেটি মায়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বাবার আর দাদুর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখছিল, আর ভয় পাচ্ছিল। দাদুকেই তার বেশি ভয় করছিল। বাবাকে তার বিশেষ ভয় ছিল না। বাবাকে সে চিনত বেশী।

সুষমার ভাই বলেছিল, 'জামাইবাবু, তুমি চুপ কর একটু। বাবা তুমি ভেতরে চলো।'

ফকির বলেছিল, 'আমার চুপ করার কি আছে। ওবেলা এসেছি, এবেলায় যাব। বলতে এসেছিলাম, ছেলে বউকে বাড়ী নিয়ে যাব। সেই থেকেই তো আরম্ভ হলো যত কুচ্ছো। যাক্‌গে, এসব কথায় আমি আর থাকতে চাই না। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

সে সুষমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার জবাব দিয়েছিল শ্বশুর, 'না, যাবে না ও। এই তো মেয়ের হাল হয়েছে, না খেয়ে মরতে যাবে?'

ফকির আর শ্বশুরের দিকে তাকায় নি। সুষমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল।

সুষমা বলেছিল, 'এই অবস্থায় কি যাওয়া যায় বল? কয়েকটা দিন পরে তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে এস, তখন যাব।'

ফকিরের মাথায় তখন রক্ত ফুটছে। বলেছিল, 'না, আমি আর এ বাড়িতে কোনদিন আসব না। যাবে তো আজই চল।'

শ্বশুরকে ধরে তখন বাড়ির ভিতরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই চিৎকার করে উঠেছিল, 'না যাবে না। আর তুমি এ বাড়িতে না এলেও মেয়ের দিন যাবে।'

ফকির বলেছিল, 'তবে তাই থাক।'

ফকির ঘর থেকে বেরুতে উপক্রম করেছিল। সুষমা ডেকেছিল, 'শোন, একবারটি শোন।' ফকির ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে তখন সুষমা আর ছেলে ছাড়া বাড়ির আর কেউ ছিল না। সুষমা বলেছিল, 'কবে আসবে বললে না?'

ফকির বলেছিল, 'কেন, আমার গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই, আবার আসব? তোমার বাপ বলেছে, সে জানবে তোমার বিয়ে হয় নি। এখন তুমিও যদি সেটা ভাব, তা হলেই সব ল্যাটা চকে যায়।'

সুষমা সেই সময়েও হাসবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'ওসব তোমাদের রাগের কথা, আমাকে টেন না।'

ফকির বলেছিল, 'তোমারেও বলি, আমার এই অপমানের পরে তুমি যদি এক দণ্ড এখানে থাক, তবে আর আমার বাড়িতে এস না।'

সুষমার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'এক কথায় এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বললে?'

'ছোট বড় জানি না, যা বুঝেছি তাই বলেছি।'

'কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ-বিষুধ খেয়ে, অসুখ সারিয়ে যাব তাই কথা ছিল। আমার শরীর যে একটুও সারে নি।'

'ওসব বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গতরে অসুখ বারো মাস লেগেই থাকে।'

'কেন, আমার অসুখের কথা কি মিছে?'

'তা জানি না। যেখানে আমার এত বড় অপমান, সেখানে তুমি থাকতে পারবে না।'

সুষমার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তুমিও তো বাবাকে কম অপমানটা করনি। কেবল কি তোমাকেই অপমান করা হয়েছে?'

মুহূর্তের মধ্যে, আর একবার ফকিরের মাথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল, 'বটে! জানি, মুখুজ্জের মেয়েরা বাপের কুল নিয়ে বরাবরই কুলকুলুটি হয়। তবে বাপসোহাগি হয়েই থাক, আর স্বামীর ঘরে যেতে হবে না। আর বাপ যা বলেছে, তাই কর, আবার একটা বিয়ে কর।'

সুষমা রেগে বলেছিল, 'অসভ্যের মত কথা বলো না।'

'অসভ্য?'

'হ্যাঁ অসভ্যই তো, তোমার মুখ খুব খারাপ। যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বাড়াতে চাই না। তুমি মাকে গিয়ে সব

কথা বলো। আমি এখন যাব না, কিছুদিন পরে যাব।'

আর একবার নতুন করে অপমানিত বোধ করেছিল ফকির। এক এক সময়, যে-সব কথাকে সামান্য মনে করে মিটমাট করে নেওয়া যায়, সময়ে সেই কথা অসামান্য হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ফকিরকে সুষমা জীবনে কতবারই 'অসভ্য' বলেছে। ফকির হেসেছে ছাড়া আর কিছু করেনি। কিন্তু সে সময়ে, সেই কথাই একটা প্রকাণ্ড গালাগাল বলে বোধ হয়েছিল। সে বলেছিল, 'বুঝেছি তুমি বাপ কা বেটি। আমার মাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই চলে যাচ্ছি, তুমি স্বামী-পুত্রের মাথা খাও, আর যদি আমার বাড়ি যাও।'

সুষমা একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'চুপ চুপ, ওগো পায়ে পড়ি চুপ কর, এমন কথা বলো না।'

'বলব। হাজারবার বলব। স্বামীপুত্রের মাথা খাও, যদি যাও। স্বামীর সাতপুরুষ, বাপের সাতপুরুষের মাথা খাও, যদি যাও।'

সুষমা মুখে আঁচল চেপে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। ছেলেটা দুজনের মাঝখানে অসহায় ভয়ে তাকিয়েছিল। বাবা মাকে সে এমন ভাবে কোনদিন কথা বলতে দেখেনি আগে। বাবাকে তার এতখানি ভয় ছিল না যে, মাকে জড়িয়ে ধরবে। তবে বাবার ওপরে তার রাগ হয়েছিল মাকে অমনি করে কাঁদাবার জন্যে।

ফকিরের মাথায় তখন এত রক্ত উঠে গিয়েছিল, শুধু মাথার দিব্বি দিয়ে চলে আসতে পারছিল না। তারপরেও সে বলেছিল, 'বাপের ঘরে টাকা থাকলে অমন অসুখের অছিলা অনেক করা যায়। বুঝিচি, গরীব ডাক্তারের ঘর আর ভাল লাগছে না, এবার বাপের ঘরে দেওয়া নাগরে মন উঠবে।'

সেই মুহূর্তে সুষমা, চোখের জল নিয়েই, দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। তীব্র গলায় বলে উঠেছিল, 'তুমি সত্যি ছোটলোক, সত্যি ইতর। এতবড় কথা বলছ তুমি আমাকে?'

সুষমার সেই দপদপে রাঙা মুখ, টানা টানা বড় রাঙা চোখ দুটির কথা একবারও ভুলতে পারে না। কেন যে সে সুষমাকে সেই সময় ওভাবে অপমানকর কথাগুলো বলছিল, নিজেও তা জানত না। সুষমাকে কোন দিনই সে এত ছোট বা মন্দ ভাবে নি। তার সম্পর্কে ও ধরনের চিন্তা কখনো তার মাথায় ছিল না। অথচ সে নিজেকে দমন করেও রাখতে পারছিল না। শুকনো খড়ের গাদায় আগুন লাগলে তা যেমন সহজে নেভানো যায় না, তেমনি করেই তখন ফকিরের মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলছিল। সে আরো নোংরা, আরো নিষ্ঠুর কথা বলেছিল, 'তা বটে, আমি তো ইতর ছোটলোকই, ফুলেরিতে গাড়ি চালিয়ে খাই। তোমাকে এতবড় কথা বলা ভুল, যার অমন বাপ ভাই আছে, তার কত বুকের পাটা। তা অমন বাপ ভাই থাকতে আর বাইরের নাগর তোমার দরকার হবে না। চিরকাল সিঁদুর পরে, মাছ খেয়ে এখানেই থেকো।'

সুষমা তৎক্ষণাৎ বাইরের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দপদপে চোখে ঘৃণা উৎক্ষিপ্ত স্বরে বলেছিল, 'বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে। তুমি মহাপাপ, তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার দিব্বিই আমি মেনে নিলাম, তুমি না নিতে এলে আর তোমার ঘরে কোনদিন যাব না। আয়তো ফড়িং, চলে আয়।'

ছেলের হাত ধরে সুষমা বাড়ির ভিতর চলে গিয়েছিল। ফকিরও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির বাইরে, বাঁশঝাড়ের পাশে, রাস্তার ওপরে তার গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। বউ ছেলে নিয়ে যাবার জন্য গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল ; তখনো গাড়িটার এত দুর্দশা হয় নি।

বাইরে গিয়ে লাট্টু-গিয়ার টেনে দিয়ে, গাড়ির হ্যাণ্ডেল মেরে ষ্টার্ট করেছিল। তারপরে, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের মত শব্দ করে জবাগ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাইল কাঁচা রাস্তা যাবার পরে বৈদ্যপুর কালনার পাকা রাস্তায় পড়েছিল।

ততদূর যেতে যেতে, সাপের যেমন দংশনের পর নিজের একটা বিষক্রিয়া হয়, তেমনি হয়েছিল ফকিরের। বিষেরও বিষক্রিয়া আছে। সাপ যেমন ছোবল দিয়ে বেশী দূর যেতে পারে না, বিষ ছেড়ে দিয়ে অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে, ফকিরও তেমনি গিয়েছে। পাচের রাস্তায় পরে সে গাড়ীটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। মনটা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। অনুশোচনা হয়েছিল। ও কথাগুলো তার সুষমাকে বলা উচিত হয় নি। শত হলেও ফড়িংএর মা। নিজের সর্বস্ব দিয়ে, ফকিরের সংসার করেছে। ফকির ফুলোর থেকে বাড়ি গেলে, তাকে অনেক যত্ন করেছে। নিজের হাতে ফকিরের গা পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছে। বলেছে, 'রাজ্যের রাস্তার ধুলো বালির মধ্যে ঘোর, তা নিজেকে একটু সাবান জলে পরিষ্কার রাখতে পার না?'

নিজের জন্যে সোনার একটি অলংকারও রাখেনি। ফড়িং-এর অন্নপ্রাশন থেকেই বউয়ের অলংকার বিক্রি শুরু হয়েছিল। তাকে অমন অপমানকর কথাগুলো বলা ঠিক হয় নি।

মনের মধ্যে একটা যুক্তিও মাথা চাড়া দিয়েছিল, সুষমা তো চলে এলেই পারত। স্বামীর এমন অপমানটা সে দাঁড়িয়ে দেখেও বাপের বাড়িতে থাকতে চাইল কেমন করে। আবার নিজেই মনে মনে-জবাব দিয়েছিল, সে কথা পরেও বোঝাপড়া করা যেত। গালাগালগুলো দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, মাঠের দিকে চেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে সুষমার স্ফুরিত ক্রুদ্ধ মুখখানির কথা ভেবেছিল। তারপরে কাটোয়া হয়ে, বাড়ি গিয়ে মোটামুটি সব ঘটনাই তার মাকে বলেছিল। মাও তাকে ভাল বলে নি। শ্বশুরের উপর রাগ করে তার নামে গালাগাল দিয়েছিল বটে, বউকে কটু কথা বলার জন্য মা তাকেই বকেছিল। কিন্তু মা আসলে সারারাত ঘুমোতে পারে নি ফড়িংএর জন্য।

নাতীটি যেমন ঠাকুরমার চোখের মণি, নাতীটির কাছেও তেমনি ঠাকুমা ছাড়া কথা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, সেবার ফড়িং এর জন্যই সুষমাকে আনতে গিয়েছিল সে। এদিকে যখন ঠাকুমা হেঁদিয়ে পড়ছিল, নাতীর অবস্থাও খারাপ। নাতীর দিনরাত্রিই ঠাক্‌মা ঠাক্‌মা। ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ঠাক্‌মার শোকে। সুষমা নিজেই তার শাশুড়িকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, ফড়িং খেতে বসতে শুতে যেরকম ঠাক্‌মার কথা বলছে, ঠাক্‌মার কাছে যাবার জন্যে কান্না বায়না করছে, তাতে তাকে আর জবাগ্রামে রাখা যাচ্ছে না। এমন কি সে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাক্‌মার নাম করে ডেকে ওঠে। ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। অথচ সুষমার যে কারণে পিত্রালয়ে যাওয়া, সেই চিকিৎসা চললেও, শরীর মোটেই ভাল হয় নি। কিন্তু ছেলেকে আর জবাগ্রামে রাখা ঠিক হবে না, তাকে ঠাক্‌মার কাছে পাঠাতেই হবে। তাতে যদি, সুষমাকেও যেতে হয়, অগত্যা তা যেতে হবে। ফড়িং-এর বাবা যেন আসে।

সেই চিঠির ভিত্তিতেই ফকির গিয়েছিল। ফকিরের বাবা জীবিত থাকতেই তার শ্বশুর আর চিঠি লিখত না। ফকিরকে কোনদিনই লেখেনি। যাওয়া আসার কথাবার্তা যা কিছু বউয়ের চিঠিতেই হত। কিন্তু শ্বশুরের অপমানকর কথাবার্তার পরিণতি ঘটেছিল অন্যরকম। অথচ, আসলে যার জন্যে যাওয়া, সেই ছেলেকে রেখেই চলে এসেছিল ফকির।

মাসখানেক পরে আবার সুষমার চিঠি এসেছিল শাশুড়ির কাছে। ছেলেকে ঠাক্‌মার কাছে না নিয়ে গেলে একটা বিপরীত কিছু ঘটে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। ছেলে আর একটুও থাকতে পারছে না। চিঠি পড়ে, মা নিজেই যেতে চেয়েছিল। ফকির সেটা পারে নি। সঙ্গে এক জ্ঞাতিভাইকে নিয়ে সে নিজেই গিয়েছিল। নিজে গাড়ি নিয়ে জবাগ্রামের বাইরে, হেলথ্‌ সেন্টারের হাসপাতালের কাছে

দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে পাঠিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি! ফকিরের মনে মনে কেমন একটা আশা হয়েছিল, সুষমাও চলে আসতে পারে ছেলের সঙ্গে।

জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে শুধু ছেলেই এসেছিল। ফকির ছেলেকে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর মা এল না?'

ছেলে বলেছিল, 'না, মা কোনদিন আর আসবে না বলেছে। তুমি মাকে বকেছিলে কেন?'

বুকের কাছে কেমন করে উঠেছিল ফকিরের। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সে তো ঝগড়ার কথা রে, তা বলে মা বাড়িতে আসবে না? তুই আসতে বললি নে?'

'বলেছিলুম।'

'তা কী বললে?'

'কিছু বললে না। আমাকে ধরে খালি কাঁদতে লাগল। আর বললে, মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যাস ফড়িং।'

ফকিরের বুকের কাছে কথা আটকে ছিল। আর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেকে। সে একটা দৃশ্য-বটে নাতী ঠাকুমার মিলন। কথায় নাকি বলে, মায়ের থেকে বেশী যে, তাকে বলে ডান, অর্থাৎ ডাইনি। কিন্তু নিজের ছেলে আর মেয়ের বেলায় ফকির এ কথায় বিপরীত দেখছিল। ফড়িং তার মাকে ছাড়া থাকতে পারতো, ঠাক্‌মাকে ছাড়া নয়! আর এই কারণেই, ছেলেটা কোনদিন মামাদের বা দাদু দিদার প্রিয়পাত্র হতে পারে নি। একরকম ভালই হয়েছিল। তবু অন্ততঃ তার ছেলে জবাগ্রামের মুখুজ্জেদের ন্যাওটা হয় নি!

কিন্তু সুষমার না আসায়, প্রথমদিকে অভিমান হলেও, তার দিক থেকে যখন কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি, তখন ফকিরের মনও আবার

আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠেছিল। সুষমার এত যদি জেদ, তবে সে চিরদিন বাপের বাড়িতেই থাকুক। এমন কি, ফড়িংএর খবর জিজ্ঞেস করে, মাকে সে যে চিঠি লিখত, তাতেও ফকিরের প্রসঙ্গে একটি কথাও থাকত না। যেন ফকির নামে কোন মানুষের অস্তিত্বই নেই তার কাছে। এত তেজ! বেশ, ফকিরও কোনদিন জিজ্ঞেস করবে না। এমন কি, এতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ফকির, ছেলেকেও পারতপক্ষে জবাগ্রামে যেতে দিতে চাইত না। নেহাত মায়ের অনুরোধে পড়ে, কারুর সঙ্গে পাঠাত। দু একদিন বাদেই আবার ছেলে চলে আসত।

তারপরে মা মারা যাবার পর দেশের বাড়িতে একলা ছেলেকে রাখা গেল না। নিয়ে আসতে হল নিজের কাছে। ফকিরের তো গাড়ি না চালাতে পারলে চলবে না। তাই ফুলেরিতেই হরেকৃষ্ণদের বড় কাপড়ের দোকানের পাশে একটি ঘর ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে এসেছিল।

ফুলেরির ফাঁকা লাইনের উপর গুমগুম্ করে একটা মালগাড়ি চলে গেল। ফকির মুখ তুলে দেখল। যাত্রীর ভিড় দেখে সে বুঝল, হাওড়ার গাড়ি আসছে। কে জানে, যাত্রী জুটবে কি না। যদি জোটে, তখন দরজাগুলো লাগালেই হবে। তখন ফড়িংকে ডাকলেই হবে।

কিন্তু আজ একটু উতলা হয়ে উঠল ফকিরের মন। অনেকদিন এসব কথাবার্তা মনে হয় নি। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ফড়িংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরো বেশীকরে মনে পড়ে গেল ছেলেটা ফকিরের প্রায় কিছুই পায়নি। রঙে, চোখে মুখে, সব কিছুতে একেবারে মা বসানো। সুষমাকে তো দেখতে খারাপ নয়। বরং সুন্দরীই বলতে হবে। টকটকে না হোক, ফরসা রঙ, টানা

কালো চোখ। প্রতিমা ভাবের দেখতে।

ছেলেটার মুখ চোখ অবিকল মায়ের মতই হয়েছে ! কিন্তু ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, লেখাপড়া শিখল না, এই একটা দুঃখ। ফকিরের একটা তো মস্ত দোষ, সে গরীব। তা বলে গরীবের ছেলের কি লেখাপড়া হয় না? তাও হয়, সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল। ফকির রইল পড়ে গাড়ি নিয়ে ফুলেরিতে। ছেলে ঠাক্‌মার আদরে আদরে আর ঠাক্‌মাকে মানতে চাইত না। লেখাপড়া ফেলে মাঠে বাদাড়েই ঘুরেছে। তারপরে মারা যাবার পর, এখানে এনে পড়াবে ভেবেছিল। তাও হল না। কথায় বলে বামুন গেল ঘর, তো লাঙল তুলে ধর। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল খারাপ। ফকির বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে, ফিরে এসে শোনে, ছেলে স্কুলে যায় নি। ফুলেরিতে তো ছেলেকে ভরতি করে দিয়েছিল ফকির।

বকা-ঝকা মার-ধোর, সবরকমই হয়েছে। এমন ইল্লুতে ছেলে, কালী ঘোষালের সঙ্গে তার গাড়ি মেরামতের কাজ করে। সে কথা আবার ফকিরকে শুনতে হয় অন্যের মুখ থেকে। বলে কী না, তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখবে কালীর কাছ থেকে।

তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখবে কালী ঘোষালের কাছে। ওরে ব্যাটা, নিকুচি করেছে তোর লেখাপড়ার। চল্ কত গাড়ি চালানো শিখবি। প্রথমে রাগ করে, তারপরে যত্ন করেই কাজটা শেখাবার চেষ্টা করেছে ফকির। যাকগে, সকলেরই তো আর লেখাপড়া হয় না। একটা কাজ শেখাও তো খারাপ নয়।

এখন দেখ, এই রোগা রোগা নড়বড়ে হাত পা ছেলের, এই গাড়ি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যায়। বয়স তো এই ১তের। যে গাড়িতে স্টার্ট দিলে গাড়ির শরীর থরথরিয়ে কাঁপে, যে কাঁপুনিতে মনে হয়, ছেলের

হাতের ডানা শুদ্ধ খুলে পড়ে যাবে, সেই গাড়ি নিয়ে অনায়াসে মেঠো পথে ট্রিপ মেরে আসে। এখন এ গাড়ির কোথায় কী গোলমাল সে কথা ফড়িং যত জানে, ফকিরও জানে না। গাড়ি স্টার্ট দিলে, এমন ভেজালের শব্দ হতে থাকে, তার মধ্যে কোথায় কতটুকু গোল-মালের আওয়াজ আছে, ফকির টের পায় না। ফড়িং ঠিক কান খাড়া করে শোনে, টের পায়।

ফকিরকে কিছু বলতে হয় না, নিজেই গাড়ি পরিষ্কার করে, রোজ ধোয়। তলায় শুয়ে সারায়। বাপের গাড়িটা এখন প্রায় ওর হয়ে গিয়েছে। তবে যাত্রী ভয় পায়। তারা যখন দেখে, রোগা ডিগডিগে, ফর্সা বড় বড় চোখ একটা ছেলে গিয়ে চালকের আসনে বসেছে, তখন বলে ওঠে, 'ও বাবা, এর হাতে গাড়ি চললে যেতে ভরসা পাব না বাবা।'

তারপরে চালানো দেখলে একটু ভরসা পায়। তবু পুরোপুরি নয়। সে ভরসা কি ফকিরের আছে? সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আড়চোখে ছেলের হাত পায়ের দিকে সব সময় নজর রাখে। জি. টি রোডকেই ভয়টা বেশী। তার ওপরে ফড়িং যখন আবার অন্য গাড়ির সঙ্গে রেস্ দিতে যায় বা লরি বাসকে পাশ দিতে না চায়, তখনই বড় ভয়ের কথা। ওদের কি বিশ্বাস আছে? ওদের বিশ্বাস নেই। একটু ঠেকিয়ে দিলেই হল। আর দিলেই সোনা।

অবিশ্যি এ গাড়ির জান অনেক শক্ত। জীপের মত চলতে পারে, আজকালকার গাড়ি থেকে অনেক উঁচুও বটে। ইদানিং সাইলেন্স গিয়ারটা ভেঙে গিয়ে একটু আওয়াজ দিচ্ছে বেশী। তা হলেও, আজকালকার টিনের গাড়ি নয়। সত্যিকারের লোহার গাড়ি। তবে হ্যাঁ, একটা বড় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা সইবে কেমন করে।

তাই এখনো ফড়িংএর পাশে বসে ফকিরকে বলতে হয়, 'হর্ন দে।' 'আস্তে যা, বাঁয়ে ঘঁষ, হাত দেখিয়ে পাশ দে। সামনে গরুর গাড়ি, হর্ন মার, ডাইনে কাট।'

কোন কোন সময় ফড়িংএর জেদ চাপে। হয়তো পাশ দিতে চায় না। বাপের কথাও তার কানে যায় না। তখন ফকির চিৎকার করে ধমকে ওঠে, 'মারব এক থাপ্পড় হারামজাদা' তখন থেকে বলছি পাশ দে, পাশ দে।'

তবে, এ ব্যাপারে যতই বকো ঝকো মার, ছেলের মুখে রা-টি নেই। কিন্তু রা যখন দেয তখন এ ছেলের চেহারা আলাদা। সেও ফকির জানে। বাপের মদখাওয়াটি ছেলের একেবারে চক্ষুশূল।

মদ খেতে বসতে দেখলেই ছেলের মুখ গম্ভীর হয়। মুখের ওপর চোপা করে বলে, নাও, এবার গিলতে বস, টাকার ছেরাদ্দ।'

ফকিরের মেজাজ ভাল থাকলে তো ভাল। খারাপ থাকলে সে ফুঁসে ওঠে, 'এ্যাই হারামজাদা, খবর্দার বলছি, তুই আমাকে শাসন করতে আসিস না।

সে সময়ে ফড়িংও দুর্মুখ, দুর্বিনীত। বলে, 'শাসন আবার কী, গিলতে বসলে তো তোমার আব খেয়াল থাকে না। খাবার পয়সা পর্যন্ত রাখতে ভুলে যাও।'

এমন যে হযনি এক-আধবার তা নয। কোথায় থেকে ফেরবার পথে ঝোঁকের মাথায় হয়তো এত খেয়ে ফেলল যে, খাবারের পয়সা পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু সে সময়ে মন মানে না। ভাবে তা বলে মুখের সামনে এত বড কথা। ফকির হুংকার দিয়ে বলে, 'দেখবি, মুণ্ডুটা ছিঁড়বি?'

'অ্যাং ছিঁড়লেই হল আর কি। উনি মদ খেয়ে পয়সা উড়িয়ে দেবেন, সে কথা বলা যাবে না।'

তখন সত্যি সত্যি ফকির হুমকে উঠে ফড়িংকে তাড়া করে যায়। ফড়িংও সেই রকম ছেলে। ভোঁ ভোঁ দৌড়। এ ব্যাপারে মার খেতে সে মোটেই রাজী নয়। ফকিরের জান এখন আর এতটা নেই যে, এই হালকা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে দৌড়ে পারবে। তাই খানিকটা

ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ চোখে হাঁপায়। ফড়িংও দূরে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।

ফকির শাসায়, 'কোথায় যাবি, তোকে আসতে হবে না?'

ফড়িংও সমানে জবাব দিয়ে যায়, 'তোমার খোয়ারি কাটুক তারপরে আসব। তখন তো বাবা ফড়িং বাবা ফড়িং করবে।'

ফকিরের চোখ দুটো তখন এমন জ্বলতে থাকে, রাগে গা-হাত-পা কাঁপতে থাকে, মনে হয় সত্যি ছেলেকে কাছে পেলে মুণ্ডুটা ছিঁড়েই ফেলত। এতে তার মদ খাওয়া বেশী হয়ে যায়। যতক্ষণ নেশা থাকে, ততক্ষণই ফড়িংকে গালাগাল দিতে থাকে। আর ফড়িংকে গালাগাল করতে গেলেই জবাগ্রামের কথা এসে পড়ে। সুষমার কথা এসে পড়ে। যেন গালাগালগুলো আসলে ছেলেকে দেয় না, দেয় বউকে, আর বউয়ের বাপ ভাইকে দেয়।

ছেলের সঙ্গে রাগারাগি না হলেও, মদ খেলেই ফকিরের স্ত্রীর ওপর যত রাগ আর আক্রোশ, শ্বশুরের ওপর যত বিক্ষোভ, সব ফেটে পড়ে। মদ খেলেই, একটু পরে আরম্ভ হবে, 'বুঝলি ফড়িং, জবাগ্রামে কোনদিন পেচ্ছাব করতেও যাবি না। ব্যাটা আমার শ্বশুর! শালার শ্বশুরের নিকুচি করেছে। আর এই বাপসোহাগী মেয়ে·········।'

এসব কথা ফড়িং বেশীক্ষণ শোনে না। বাপের কাছ থেকে সরে যায়। মাকে গালাগাল দিলে তার শুনতে ভাল লাগে না। আর ফড়িং-এর সঙ্গে যেদিন রাগারাগি হয়, সেদিন প্রথম কথাই ফকিরের, 'জবাগ্রামের মুখুজ্জেদের দৌহিত্তির তো, তোর দোষ তো থাকবেই রে হারামজাদা। ওই মায়েরই পেটে তো জন্মেছিস্, রক্তের দোষ একেবারে যাবে কী করে। বাপের মুখের সামনে এতবড় কথা!

নিরাপদ দূরত্ব বাঁচিয়ে ফড়িংও সমানে বাপের মুখের ওপর কথা বলে যেতে পারে। এখনো ওর গলায় বয়স ধরে নি। স্বরটা শোনায় প্রায় ওর মায়ের মতই সরু আর তেজী। বরং সুষমার গলা

এখন ছেলের থেকেও যেন একটু মোটা। নিরাপদ দূরত্বের কারণ, ফকির অনেক সময় মদের গেলাস বোতলও ছুঁড়ে মারে। ফড়িং বাপের কথার জবাব দেয়, 'আর তুমি হলে ভদ্দলোক। মদ খেয়ে পয়সা ওড়াচ্ছ, বলতে গেলেই আমার দোষ। তুমি তো মাতাল।'

'খবরদার বলছি ফড়িং আমার সামনে থেকে যা।'

'যাব না। তোমার থেকে মুখুজ্জেরা অনেক ভাল।'

'কী বললি?'

শুনেই ফকির তেড়িয়ান হয়ে ওঠে। আরো জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'ঘরশত্তুর বিভীষণ তুই, তবে যা, জবাগ্রামেই যা, তোকে আমার কাছে থাকতে বলেছে কে?'

ফড়িং বলে, 'তাই যাব! ভেব না, তুমি মদ গিলবে, আর না খেয়ে তোমার কাছে থাকবো, কাল রাত পোহালেই চলে যাব।'

'যাস, যাসরে হারামজাদা।'

রাত পোহালে রাত্রের কথা আর ফকিরের বিশের মনে থাকে না। কিন্তু ফড়িং-এর শুকনো গোমড়া মুখ দেখেই ফকিরের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তখন আর না মনে পড়ে থাকে না, ছেলের রাত্রে খাওয়া হয়নি। তখন ফকিরের ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। পকেটে পয়সা কড়ি না থাকুক, ধার করেই প্রচুর খাবার নিয়ে আসে। যতক্ষণ ছেলের মান না ভাঙে, রাগ না যায়, ততক্ষণ ধরে তোষামোদ।

ব্যাপারটা তো আর ছ্যাখ্‌তাই ব্যাপার নয়। তখন ফকিরের বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে। নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে। কপাল চাপড়ে বলে, 'এমন নেশার দাস হয়েছি আমার কেন মরণ হয় না।'

শেষ পর্যন্ত ফড়িং-এর রাগ যায়। চোখের জল মোছে। খাবার খায়। ফকিরের মনে হয়, ওর মা থাকলেও বোধহয় এই রকম হত।

ছেলেটার কথাবার্তা রাগের ধরণ-ধারণ ওর মায়ের মতই। কয়েকবার ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে পালিয়েও গিয়েছে। দূরে কোথাও নয়, কাছে পিঠেই কোথাও লুকিয়ে থেকেছে। ফকিরের তখন উদ্বেগে ছোটাছুটি

ছেলের রাগের দুটি কারণ। একটি ফকিরের মদ খাওয়া। আর একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশা। ধান কলের দিকে তো যাবার উপায় নেই। হাটের দিন তাড়ির দোকানে গেলেই ফড়িং-এর টনক নড়ে। কারণ, বলা যায় না, গোটা রাত ফকিরের কোথায় কী ভাবে কেটে যাবে। ফকির নিজেও সে কথা বলতে পারে না। ফকিরকে তাই কিছু ছলনার আশ্রয় নিতেই হয়। নানান কাজের অছিলা বা কারুর সঙ্গে দেখা করবার নাম করে হয়তো একটু আড্ডা দিতে গেল।

কিন্তু ছেলে তার থেকে অনেক দড়। ফড়িং চাটুয্যে ফকির চাটুয্যের সবই বোঝে। ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ঘরপোড়া গোরু তো। নিজেই বাপকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

তবে মেয়েমানুষের ব্যাপারে মদের মত কোন নেশা নেই তার। এমন নয় যে, যেমন করেই হোক কারুর কাছে বা ঘরে যেতে হবে। চলতে ফিরতে জুটে গেল, আচ্ছা একটু ফষ্টি-নষ্টি করা যাক। তেমন সুযোগ সুবিধে যদি মিলে যায় আর মনের রঙ রক্তে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হয়তো কিছু ঘটে। তাও ন-মাসে ছ-মাসে। তা আর কী করা যাবে। মানুষ তো বটে। চুল পেকে, দাঁত পড়ে হদ্দ বুড়ো তো হয়ে যায় নি। ঘরের বউ গিয়ে বসে রইল বাপের বাড়ি। এরকম দু-একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র কী।

নিজের বিষয়ে ফকিরের এটা হল যুক্তি! তা বলে, কালী ঘোষালের মত মেয়েমানুষ নিয়ে র‍্যালা করবার পাত্র নয় সে। আর সে সব কাহিনী ইষ্টিশনের গাছ তলায় বসে যার কাছে গলাবাজী

করে বাহাদুরি করবারও লোক নয় সে। এমন কিছু মহৎ কর্মে তো নয়। সেটা ফকির বোঝে, তবে সব সময়ে পাবে না। তা এই ছেলের জন্য কোনদিকে যাবার যো আছে।

মদের ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ করবে। কিন্তু একবার যদি দেখে, ধানকল বা হটের কলের মেয়েদের সঙ্গে হেসে ঢঙে কথা বলছে, তা হলে ছেলে কথাটি কইবে না, কাছ থেকেও নড়বে না। বাপকে চেনে তো। জানে, সারা রাত হয়তো তাকে একলা ঘরে থাকতে হবে।

ফকিরকে একবার জবর শিক্ষা দিয়েছিল ফড়িং। চুঁচুড়া থেকে ফেরবার পথে পাণ্ডুয়া পার হয়ে এক জায়গায় বসে গিয়েছিল তাড়ি খাবার জন্যে। বলেছিল, 'রাগ করিস নি বাবা, এক পাওর খেয়ে আসি, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

ফড়িংএর মাথাটা ঠাণ্ডাই ছিল। কিন্তু তাড়ির আড্ডায় কিছু আদিবাসী মেয়েও ছিল। মেয়েগুলো বেবাক প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছিল। ফকিরের সঙ্গে একটা মেয়ের একটু রঙ হয়ে গিয়েছিল। নিজের তখন ঝোঁক এসেছে। মেয়েটাকেও কিনে খাইয়েছিল। মেয়েটা আবার নিজের হাতে তাকে গেলাসে ঢেলে খাওয়াচ্ছিল। সেরকম একটা অবস্থাতেই ফড়িং এসে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলে নি, খালি দেখেছিল বাপের কীর্তিটা।

ওরকম সময়ে আবার ফকিরের মেজাজ আলাদা। সে খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'এখানে এসেছিস কী করতে? যা গাড়িতে বস গে যা।'

রাস্তার পাশেই, একধারে তালপাতার ঝপড়িতে তাড়ির দোকান। আর একধার একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ফড়িং বাপের কাছ থেকে চলে এসেছিল ঠিকই। গাড়িতে উঠে, এঞ্জিন চালু করে দিয়েছিল। ফকিরের প্রথমটা তেমন খেয়াল হয় নি। তখনো সে আদিবাসী মাতাল মেয়েটির ঘরেই ছিল। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দটা কেমন যেন জোরে বেজে উঠেছিল। এ তো অন্য গাড়ি না, তার

নিজের গাড়ির শব্দ। সে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দেখেছিল ফড়িং ততক্ষণে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েছে। সে চিৎকার করে বলেছিল,, 'কী করছিস ? কোথায় যাচ্ছিস ?'

কোন জবাব আসে নি। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছিল। ফকিরও ছুটতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমে রাগ, 'ফড়িং ভাল হবে না বলছি, গাড়ি থামা, নইলে তোর হাড় মাস আজ আলাদা করব।'

সে সব তো পরের কথা, গাড়ি তখন জি. টি. রোড ধরে বেশ জোরেই চলতে আরম্ভ করে ছিল। তখন ফকিরের চৈতন্যের উদয় হয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিল, 'বাবা ফড়িং, নক্‌কী ছেলে বাবা, থাম্। চল্ একসঙ্গেই যাচ্ছি, ওখানে আর বসব না!'

তাতেও ফড়িং-এর থামবার কোন লক্ষণ ছিল না। গাড়ির গতি আরো বেড়েছিল। ফকির প্রথমে রাগে বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখছিল, গাড়িটা সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই একটা ভীষণ ভয়ে তার হাত পা কয়েক মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল। সর্বনাশ, জি. টি. রোড বলে কথা। যে কোন মুহূর্তেই একটা রাক্ষুসে ট্রাক এসে, ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। তারপরে যে রকম ছেলে, ওই গাড়ি নিয়ে হয়তো কারুর সঙ্গে রেস লাগিয়ে দেবে। গাড়িটা হয়তো যাবে। তার সঙ্গে—

না, আর ভাবতে পারে নি ফকির। ওখান থেকেই সোজা দৌড়ে গিয়েছিল রেল ইষ্টিশনে। যতক্ষণ ট্রেন আসছিল না, ততক্ষণ যেন তার নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছিল না। ট্রেন যতক্ষণ ফুলেরিতে পৌঁছায় নি, ততক্ষণও সেই একই অবস্থা তার। ফুলেরিতে গিয়ে, আস্ত ছেলে আর গাড়ি দেখতে পাবে তো ?

কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পায় নি। ছেলে না, গাড়িও না। কালী ঘোষালের গাড়িটা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তো

ঘুঘু, তাই সন্দেহের চোখে, দূর থেকে ফকিরের দিকে তাকিয়েছিল। তাকে ওরকম একলা ট্রেন থেকে নেমে আসতে দেখে ধরেই নিয়েছিল, একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই ঘটেছে।

ফকির শুধু দু-একজন রিক্সাওয়ালা আর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেছিল, তারা কেউ ফড়িংকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখেছে কী না। কেউই দেখে নি। ফকিরের মনে হচ্ছিল, তার হাত পা ভেঙে আসছে। একটা তীব্র উৎকণ্ঠা, দুঃসহ উদ্বেগে তার মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাবার মত হচ্ছিল। ভেবে পাচ্ছিল না, কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় সংবাদ পাবে।

সে আগেই ছুটে গিয়েছিল জি. টি. রোডে। সেখান থেকে বাসে উঠে, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত গিয়েছিল আবার, যদি রাস্তায় কোথাও ফড়িং গাড়ি নিয়ে বসে থাকে বা একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে থাকে। কিন্তু কোথাও ফড়িং বা গাড়ির চিহ্নও ছিল না। অতএব কোথায় যেতে পারে ফড়িং।

জীবনে সেই রাত্রিটার কথা কোনদিন ভুলবে না ফকির। এই ছেলে দেখ এখন কেমন ঘুমিয়ে আছে। এক রাত্রের মধ্যে ফকিরের বাবার নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল। পাণ্ডুয়ায় ফিরে গিয়ে আবার সেই তাড়ির ঝুপড়িতে গিয়েছিল, যদি সেখানে ফড়িং তার খোঁজে গিয়ে থাকে। সেখানে তখন রীতিমত নাচ গান শুরু হয়ে গিয়েছে। সময়টাও সেই রকম। মাঘ মাস। মাঠের কাজকর্ম শেষ। আদিবাসীদের হাতে পয়সা ধান কিছু থাকে সে সময়ে। আর খুব সহজেই ওরা একটা জায়গায় উৎসব জমিয়ে তুলতে পারে।

না, সেখানে ফড়িং যায় নি। তখন একটা সম্ভাবনা তার মনে এসেছিল। বৈঁচি দিয়ে, বৈদ্যপুর হয়ে, কালনার রাস্তায় কাটোয়ায়

চলে যায় নি তো ফড়িং। কিন্তু তা যাবে কেমন করে। গাড়িতে এত তেল কোথায়? বড় জোর কুলেরি পর্যন্ত পৌঁছে, আর দু-চার মাইল চলবার মত আছে। খুব বেশী গেলে, সে পথে কালনা পর্যন্ত যেতে পারে। তবু সে একবার বৈঁচি গিয়েছিল। বাজারের কাছে রাস্তার ধারে দোকানপাট অনেকেই তার চেনা। তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেউ তার গাড়ি আর ছেলেকে দেখেছে কি না।

না, কারুর চোখে পড়ে নি। তবে কি ছেলেটা হাওয়া হয়ে গেল নাকি! আবার সে কুলেরিতেই ফিরে গিয়েছিল। তখন, উদ্বেগে, আশঙ্কায়, দুশ্চিন্তায়, মনের মধ্যে একটি মাত্র আশ, ফড়িং রাগ করে যেখানেই যাক, হয়তো কুলেরিতেই ফিরে আসবে। আর কোথায় যাবে ফড়িং তাকে ছেড়ে।

একথা ভাবতে ভাবতে ফকিরের চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। কালা ঘোষালের মত্ত গলা শোনা যাচ্ছিল, 'আজ নাওয়া একটা কিছু কাণ্ড হয়ে গেছে জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের জামাইয়ের। গাড়ি নিয়ে ন্যাটা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।'

কালা ফকিরকে দেখতে পায় নি অন্ধকারে। ইষ্টিশনের কাছে একটা পাক দিয়ে, ফকির ঝাপসা চোখে, জি, টি, রোডের দিকে চলে গিয়েছিল। কালা ঘোষালের কথায় তখন তার কিছুই মনে হয় নি। ফড়িং-এর চিন্তায় সে ডুবেছিল। ভেবেছিল খুব শাস্তি তাকে ফড়িং দিল। ফিরে এলে, আর কোনদিন ফকির এমন কাজ করবে না।

সে পেট্রলপাম্পের কাছে গিয়েছিল। কোন আশা নেই, তবু গিয়েছিল। পাম্পের দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল কাছেই। তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দারোয়ান আমার ছেলেকে দেখেছ নাকি?'

দারোয়ান বলেছিল, 'হাঁ, দেখা বিকাল মে তো দেখা।'

প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল ফকির। জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাড়ি ছিল সঙ্গে ?'

'হাঁ ছিল, উ তো তেল লিয়ে গেল।'

তেল নিয়ে গেল ? ইস, এ কথাটা কেন আগে মনে আসে নি ফকিরের। পয়সা না থাকলেও ফড়িং যে এখান থেকে ধারে তেল নিতে পারে, এ কথাটা একবারও তার মনে হয় নি। তা হলে আর সে পাড়ুয়া ছুটে যেত না। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কত তেল নিয়েছিল ?'

দারোয়ান সেটা জানত না। ফকির ছুটে ঘরের দিকে গিয়ে পাম্পের ভবতোষ বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফড়িং কত তেল নিয়ে গিয়েছে ?'

ভবতোষ বাবু হিসাব দেখে বলেছিলেন, দশ লিটার নিয়ে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে বলতে পারেন ?'

'না তো। কেন, না বলে চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ, একটু বকেছিলাম, তাই।'

'তুমি নিজেই তো ছেলেটাকে খারাপ করেছ। এক তো হাটবাজার জায়গা। তার ওপরে ছেলেকে এর মধ্যেই শেখালে গাড়ি চালানো।'

'নিজে শেখাই নি ভবতোষবাবু, ও নিজেই শিখেছে।'

'তা না হয় বুঝলাম। তার ওপরে নিজে মদ তা খেয়ে রাস্তা কর। ছেলের সামনে এ সব করলে তার বিগড়োতে আর কতক্ষণ। দ্যাখগে সেও হয়তো কোথায় গিয়ে বাপের মত বোতল নিয়ে বসেছে।'

ফকিরের সে কথা বিশ্বাস হয় নি। ফড়িং-এর যা মন, আর যা বয়স, তাতে ওসব সে করবে না। কিন্তু কোথায় গেল সে তেল নিয়ে ? দারোয়ানটাও বলতে পারে নি কোন্ দিকে গিয়েছে।

ইষ্টিশন জি, টি, রোড থেকে একটু দূরে, আড়ালে পড়ে গিয়েছে। তাই কারুর চোখে পড়ে নি। ফকিরের মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল, কাটোয়ায় গেছে কী? সেখানে তো কেউ নেই। আর একটা কথা অস্পষ্টভাবে মনে এসেছিল, জবাগ্রামে যায় নি তো?

এখন তো ফড়িং-এর কাছেই ওর মায়ের চিঠিপত্র দু-একটা আসে। ন'মাসে ছ'মাসে ফড়িং গিয়ে মাকে দেখেও আসে। তার সঙ্গে নাকি মামারা ভাল করে কথা বলে না। কর্তাটি মারা গিয়েছেন। এক-মাত্র সুষমাই ফড়িংকে জড়িয়ে ধরে নাকি কাঁদে। ফড়িং যে শেষ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে গাড়িতে গাড়িতে ঘুরবে, এ কথা সুষমা কোনদিন ভাবে নি। সে ছেলেকে বলেছিল, 'তোর বাপ কি আমার ওপর শোধ নিতে তোর এমন সর্বনাশ করল।'

তার জবাবে ফড়িং তার মাকে বলেছিল, 'তা কেন, আমিই তো গাড়ি চালানো শিখেছি। লেখাপড়া করতে আমার ইচ্ছে হয় নি।'

ওর মা বলেছিল, 'তোর বাপ যদি নিজে লেখাপড়া শিখত, তাহলে তোকে কখনো এ কাজে টেনে নিত না। যাক্, তোর বাপ যা হয়েছে, তুইও তাই হচ্ছিস।'

সুষমার শোকটা ফকির যে একেবারে বুঝতে পারে নি, তা নয়। কিন্তু তাতে ফকির মনে কোন কষ্টবোধ করে নি। সুষমা যে বাপের বাড়ি থেকে আসার নাম করে না, এ কথা ফকিরের মর্ম পর্যন্ত একেবারে বিঁধে আছে। সুষমা নাকি কথায় কথায় দু'একবার ফড়িংকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তোর বাবা কি তাহলে জীবনটা এমনি ফুলেরির হাটে ঘর ভাড়া করেই কাটিয়ে দেবে? এখনো তো গিয়ে, নিজেদের বাড়ি ঘর দোর ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারে। তোরা তো বাপ ব্যাটা দুজন। দু'বিঘে জমি তো আছে। নিজে দাঁড়িয়ে দেখাশোনা করলে গোটা বছরের ধানটা পাওয়া যায়। আর যা হোক কোনরকমে এদিক-ওদিক করে চলে যেতে পারে।'

ফড়িং নিজের বুদ্ধিতেই বলেছে, 'কেন গাড়ি চালিয়ে তো মন্দ চলছে না। ধান বেচে তো বাবা টাকা নিয়ে আসে।'

সুষমা ছেলেকে বলেছে, 'বাপের মতই কথা শিখেছিস। এভাবে গাড়ি চালিয়ে, ঘর-দোর ছেড়ে চিরদিন কি চলবে? একদিন তো ফিরতেই হবে। তখন হয়তো কিছুই থাকবে না।'

ফড়িং মাকে বলেছে, 'টাকা জমিয়ে একটা নতুন গাড়ি কেনা হবে।'

সুষমা বলেছে, গাড়ি গাড়ি গাড়। তোর বাপ যেমন ছুটে চলেছে, তুইও তেমনি ছুটতে শিখেছিস্। তার চেয়ে তোর বাবাকে বলিস, আর একটা বিয়ে-থা করে, ভাল করে সংসার করতে। নতুন মাকে বলবি তোকে যেন ইস্কুলে ভরতি করে দেয়।'

ফড়িং ফকিরকে বলছে, এ কথা বলবার সময়ে মায়ের চোখে জল এসে পড়েছিল। নতুন মায়ের কথা বলায়, মায়ের ওপর তার একটু রাগ হয়েছিল। কিন্তু মার চোখে জল দেখে সে আর কিছু বলতে পারে নি।

ফকির জানে না, সুষমার এ কথা শুনে, সেই সময়ে তার মনটাও উদাস হয়ে উঠেছিল। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা বিড়ি কামড়ে ধরে বলেছিল, 'বিয়ে! শালা, গাড়া আবার বেলতলায় যাবে।'

ফড়িং নাকি তার মাকে জিজ্ঞাস করেছে, তুমি আমাদের কাছে চল না মা, আমরা সবাই ফুলোরিতে থাকব।'

সুষমা বলেছে, 'তা কেন, আমার শ্বশুরের অত বড় ভিটে থাকতে ফুলেরির হাটে ভাড়া ঘরে থাকতে যাব কেন।'

ফড়িং জিজ্ঞেস করেছে, নিজেদের বাড়িতে গেলে তুমি যাবে?'

সুষমা একটু চুপ করে থেকে বলেছে, তা যেতে পারি, তোর বাবা যদি এসে নিজে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়, তবে যেতে পারি।'

'কেন, বাবা না ডেকে নিয়ে গেলে যাবে না?'

'না, কোনদিনই না। তোর বাবা আমাকে যে কথা বলে গেছে, তারপরে আর আমি যেচে কোনদিন যেতে পারব না।—পারতাম—'

এই পর্যন্ত বলে সুষমার গলাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে আবার বলেছিল, 'তবু যেতে পারতাম, যদি তোর ঠাকুমাও একবার আমাকে নিতে আসত।'

সুষমা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করেছিল। ফকিরের মনটা মুহূর্তের জন্য নরম হলেও, মুখটা আবার শক্ত হয়ে উঠেছিল। কেন, এত তেজ কিসের? স্বামী কি স্ত্রীকে দুটো চারটে আজে-বাজে কথা বলতে পারে না? রাগের মাথায় কথা বলেছে, তার কী মূল্য আছে। সেও তো ফকিরকে ছোটলোক ইতর কত কী বলেছিল। তার স্বামী যদি দুটো কথাই বলে থাকে, স্বামীর ঘরে আর যাব না, এটা বা কেমন কথা। স্ত্রীর কাছে তো স্বামীর ঘরই সব থেকে বড়।

তা নয়, সুষমা আসলে বাপের বাড়ির আয়েসে আরামে থাকতেই ভালবাসে। তবে অবিশ্যি সুষমা নাকি ফড়িংকে বলেছে, 'তোর বাপের ঘর থেকে এ ঘর আমার বেশী আপন নয়। কিন্তু তোর বাবা যে কথা আমাকে বলেছে, সে কথা আমাকে কালব্যাধির মত আঁকড়ে আছে। স্বামীর সব গালাগাল মানতে পারি, কিন্তু বাপ ভাই নিয়ে খারাপ বললে, সে সইতে পারি না। তাই, তোর বাবা এসে নিয়ে গেলে তবু মনে একটা শান্তি পাব। জানব, সত্যি সে আমাকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তার মনে অনুতাপ দুঃখ হয়েছে। তা নইলে আর কি হবে, এ জন্মটা এ-ভাবেই কেটে যাবে।' ..

কথাগুলো শুনে ফকিরের মনটা আবার বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু একটা নিঃশ্বাসে মনের সবই উড়িয়ে নিয়েছিল। প্রায় আট বছর হতে চলল, এত দিনে যখন যায় নি, তারও এ জন্মটা এ ভাবেই

কেটে যাক। এখন সুষমার মুখটা ফকিরের ভাল মনে পড়ে না। একমাত্র ফড়িং-এর দিকে চেয়ে একটা ঝাপসা অস্পষ্ট মুখ ভেসে ওঠে। ফর্সা, একটু গোল ধাঁচের একটি মুখ। ডাগর চোখ, টিকলো নাক। মুখখানি শান্ত। ঘোমটার পিছনে খোঁপাটা ফুলে আছে।

কিন্তু, যন্ত্র অব্যবহারে যেমন মরচে পড়ে যায়, ফকিরের মনের অবস্থাটা অনেকটা সেই রকমের। আট বছর ধরে চোখের বাইরে, তা যেন অনেকখানি মনের বাইরেও চলে গিয়েছে। তার নিজের একটা অন্য জীবনও গড়ে উঠেছে। সে জীবনটা এমনই ছুটন্ত, চলন্ত, নিয়ত বহির্মুখী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস ভাবনাগুলোও এমন ভাবে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কোথাও যেন সুষমাকে মেলানো যায় না, খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কোন উৎসাহও সে বোধ করে না।

তবে, ফড়িং যতবারই ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে, ততবারই বলেছে, সুষমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফকির ভাবে, কেন। বড়লোক বাপের বাড়িতে থেকেও, সুষমার শরীর খারাপ হচ্ছে কেন।

ফকিরকে কে বোঝাবে, পুরুষের ক্ষেত্রে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে, তাদের স্ব স্ব বিষয়ে, তারা হয়তো, অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক এবং যুক্তিতেও যত্নবান, আত্মসম্মান বোধ বা জীবনের নানান ছকে বাঁধাধরার মধ্যে সীমিত। কিন্তু পুরুষ কখনো কখনো এত অন্ধ যে, মেয়েদের খুব সহজ বিষয়টুকুও তার চোখে পড়ে না। তা না হলে সে সুষমার শরীরের বিষয়ে এমন একটা বাঁকা বিদ্রূপের চিন্তা করতে পারত না। তার বুকের মধ্যে, তার মস্তিষ্কের সীমার মধ্যে একটা অপমানের গ্লানি গভীর ভাবে আশ্রয় করে আছে সত্যি। কিন্তু সুষমার দিনে দিনে বর্ধিত অসুখের বিষয়ে, এ ভাবনাতেই ফকিরের দায়িত্ব শেষ হয় না।

কিন্তু এ কথা ফকিরকে কে বলবে।

সেই রাত্রে ফকিরের মনে তখন এই কথা উদয় হয়েছিল, জবাগ্রামে ওর মায়ের কাছে যায় নি তো ফড়িং। মাসখানেক আগেই তো গিয়েছিল। আবার যাবে কি? বিশেষ যে বাড়িতে গেলে, মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকা ছাড়া কারুর সঙ্গে ফড়িং কথাও বলতে পারে না। মামারা তার সঙ্গে কথা বলে না। ড্রাইভারের ছেলে, ড্রাইভারি শিখেছে, মাত্র সাত-আট মাইল দূরে ফুলেরিতে ভগ্নিপতি ভাগনে গাড়ি চালাচ্ছে, এতে তাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই, ফড়িং-এর উপরেও তাদের মন বিষ হয়ে গিয়েছে। তাই ফকির ভেবেছিল, কথা নেই, বার্তা নেই, গাড়ি নিয়ে জবাগ্রামে চলে যাবে ছেলেটা?

মন থেকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ অন্য আর কিছু মাথায়ও আসছিল না। কাটোয়ার মত দূর জায়গায়, একলা সেই বিশাল পোড়ো বাড়িটায় নিশ্চয় যায় নি। এইরকম নানান কথা ভাবতে ভাবতে, পেট্রল পাম্পে ঢোকবার মুখে, সাঁকোটার ওপরে চুপ করে বসেছিল ফকির। একটা বিড়ি ধরিয়েছিল আনমনে।

রাত্রের জি টি রোড সব থেকে মুখর ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চলের মালবাহী ভারী লরী ট্রাক যাতায়াত করছিল। রাস্তাটা যেন একটা মুহূর্তও ফাঁকা নয়। নিরন্তর চলতে চলতে কখন যে কোন ড্রাইভারের চোখে ঘুম নেমে আসে, কেউ বলতে পারে না। তারপরে দেখা যায়, গাড়ি উল্টে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

ফকির ভাবছিল, কারুর কাছ থেকে একটা সাইকেল চেয়েনিয়ে জবাগ্রামে চলে যাবে কী না। জবাগ্রামে যেতে তার খুবই বিরাগ, একেবারে অনিচ্ছা, বিশেষ সেই মুখুজ্জেবাড়ির সামনেই গিয়ে দাঁড়ানো ফকিরের কাছে একটা ক্ষুব্ধ কষ্টের বিষয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট

হয়ে বসে থাকতেও পারছিল না যেন। ভয় হচ্ছিল, সেখানে গিয়েও যদি শোনে, যায়নি, তা হলে ফকির কী করবে ?

সাঁকোটার ওপরে বসে, কিছু স্থির করতে না পেরে, ফকির চুপচাপ বসেই ছিল। ইষ্টিশনের দিকে বা ঘরে যেতে পারছিল না। সেখানে বসে বসেই তার যেন ঝিমুনি ধরে আসছিল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ফকির চমকে উঠেছিল। কেমন একটা চেনা শব্দ যেন, তার একেবারে বুকের ভিতর গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। সে চমকে তাকিয়ে দেখেছিল, একটা গাড়ি ইষ্টিশনের পথে মোড় বেঁকছে। চিনতে দেরী হয় নি গাড়িটা। ফকির লাফ দিয়ে ছুটে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ফড়িং, ফড়িং দাঁড়া !'

গাড়িটা ক্যাঁচ করে একটা শব্দ করে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গিয়েছিল। ফকির ছুটে গাড়িটার কাছে গিয়েছিল। রাস্তার আলোয় দেখেছিল, ষ্টিয়ারিং ধরে ফড়িং বসে আছে। কিন্তু যে ফড়িং গাড়ি নিয়ে রাগ করে চলে গিয়েছিল, তখন আর সে ফড়িং ছিল না। বিব্রত ভয়ের ছায়া তার চোখে মুখে। ফকিরের দিকে একবার তাকিয়ে ও মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ফকিরের হাত মুঠি পাকিয়ে এসেছিল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। গলার কাছে একটা গর্জন ফেটে পড়ার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে পড়েছিল। মুখ নরম হয়ে উঠেছিল। ফড়িং-এর চুপচাপ, ঘাড় গুঁজে নিচু মুখ করে থাকা দেখে ফকিরের মনটা হঠাৎ কেমন টনটনিয়ে উঠেছিল। কোথায় ছিল ফড়িং, সেই বিকাল থেকে এই রাত্রি বারোটা অবধি।

কথাটা জিজ্ঞেস না করে, ঘুরে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাঁ পাশে বসেছিল। বলেছিল, 'চালা।'

ফড়িং গাড়ি চালিয়ে বাসার কাছে এসেছিল। তাদের ঘরের কাছেই, দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা সরু জায়গায় গাড়িটাকে তুলে দিয়েছিল ফড়িং। গাড়িটা রাত্রে এখানেই থাকে। দুজনেই নেমে এসেছিল। পকেট থেকে ঘরের তালার চাবি বের করতে করতে ফকির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় গেছিলি?'

কোল বসা বড় বড় চোখ দুটো তুলে, ফকিরকে একবার দেখে ফড়িং বলেছিল, 'মায়ের কাছে।'

জবাগ্রাম বলে নি ফড়িং। মায়ের কাছে গিয়েছিল। তাড়ির ঝুপড়িতে বাবাকে আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে ছেলে মায়ের কাছে গিয়েছিল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ফকির হারিকেন জ্বালিয়েছিল। পিছনে আর একটা দরজা। সেটা খুললে তার একটা ছোট ঘর, রান্না হয় সেখানে। তার পাশেই একটি বাঁধানো জায়গা, সেখানে হাত মুখ ধোবার বা স্নানের জায়গা। সকালবেলাই বালতিতে জল ভরে রাখা ছিল।

শীতটা যাবার মুখে, তবু শেষ মাসেও একটু শীত ছিল রাতের দিকে। জামাটা না খুলেই, পিছনের দরজা খুলতে খুলতে ফকির আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'খেয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

ফকির পিছনে গিয়ে জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেছিল। ততক্ষণে ফড়িং মাদুর তোষক পেতে বিছানা করতে আরম্ভ করেছিল। বিছানা পেতে ও নিজেও হাত মুখ ধুয়ে এসেছিল। ফকির ততক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিল। ফড়িং বাবার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মত জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

ফকির একটা বিড়ি ধরিয়ে বলেছিল 'খাব না।'

ফড়িং শুতে যাচ্ছিল না। বাবার দিকে তাকিয়েছিল। ফকির

তার দিকে তাকাচ্ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, ফড়িং অন্যায় বোধে কথা বলতে পারছে না। তবু বলেছিল, 'এখনো তো কিষেণ-জীর দোকান খোলা আছে, রুটি তরকারী নিয়ে আসব ?"

লরীওয়ালাদের জন্য কিষেণজীর দোকান প্রায় সারা রাত্রিই খোলা থাকে। ফকির গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'না। তুই শুয়ে পড়।'

ফড়িং আর কথা বলতে সাহস পায়নি। এক পাশে শুয়ে গায়ে কাঁথা টেনে দিয়েছিল। বাতিটা তেমনি জ্বলছিল, ফকির বিড়ি টেনে যাচ্ছিল. তারপরে জিজ্ঞেস করেছিল 'কী বললি সেখানে ?'

সেইটাই ফকিরের তখন চিন্তা। কে জানে. ছেলেটা কী বলে এসেছিল আবার ওর মাকে। আদিবাসী মেয়েটার কথা যদি বলে এসে থাকে তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। আট বছর যার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত নেই, যার কোন কথাতেই ফকিরের আর বোধহয় কিছুই যায় আসে না, তার কানে তাড়িখানার ঝুপড়ির খবর গেলে ফকিরের এত লজ্জার কারণ কী সে নিজেই তা জানত না।

ফড়িং বলেছিল, 'মাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি।'

ফকির প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী জন্যে ঝগড়া ?'

'তাড়ি খাচ্ছিলে বলে।'

ফকির ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। প্রায় ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাজে বাজে কথা কিছু বলিস নি তো ?

'না।'

ফকিরের বিশ্বাস হয়েছিল। ফড়িং মিথ্যে কথা বলে না। তবু ফকির ছেলের মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে বলেছিল, 'অবিশ্যি বললেই বা আর কী হত।'

ফড়িং বলেছিল, 'মার কষ্ট হত, রাগও হত।'

আশ্চর্য, ফড়িং এত বোঝে? তের বছরের ছেলের এত বুদ্ধি হয়েছে যে মায়ের কোন কথায় লাগবে, রাগ হবে।

সেটাই মানুষের বিড়ম্বনা, বড়দের বিড়ম্বনা ছোটদের শরীরের মত, সবকিছুই তারা, তাদের ছোট মনে করে। তারপরে দুজনেই চুপ করেছিল।

ফড়িং আবার বলেছিল, 'মা আমাকে খুব বকেছে।'

'কেন?

'তোমাকে না বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেছি বলে।'

'সে কথা না বললেই পারতিস?'

'মাকে মিছে কথা বলব?'

ফকির কোন জবাব দিতে পারে নি। ফড়িং বলেছিল, 'তাই মা আমাকে রাত্তিরে থাকতে দিলে না। তুমি সারা রাত্তির ভাববে, তাই পাঠিয়ে দিল। আমারও চলে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল।

ফকিরের চোখের সামনে সুষমার ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠেছিল। কথাটা তো সুষমা মিথ্যে বলে নি। ভাবতে পেরেছিল কেমন করে?

আবার চুপচাপ। ফড়িং ডেকেছিল, 'বাবা'।

'হুম্!'

'না খেলে তোমার শরীর খারাপ হবে।'

ফকির বলেছিল, 'না, তুই ঘুমো।'

ঘুম আসছিল ফড়ি-এর। তবু সে বলেছিল, 'মার শরীরটা আরো খারাপ হয়ে গেছে।'

ফকির সে কথার কোন জবাব দেয় নি। কিন্তু কথাটা তার কানে গিয়েছিল। সে কোন রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পারে নি মনে মনে। কেবল ভেবেছিল, সে দোষ কি আমার? কিছুক্ষণ

পরে ফকির পাশ ফিরে দেখেছিল, ফড়িং ঘুমিয়ে পড়েছে। ফকির আস্তে আস্তে উঠেছিল। হ্যারিকেনটা হাতের কাছে এনে নেভাবার আগে, একবার ফড়িং-এর মুখের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। কেন যে বুকটার মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারে নি। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে রেখে, একটা হাত সে ফড়িং-এর বুকের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে মনে বলেছিল, 'ঠিক জায়গাতেই গেছিলি। ফিরে যে এসেছিস, সেও ভাগ্য !...

হাওড়ার গাড়িটা এসে দাঁড়াল ইষ্টিশনে। সেই শব্দেই ফড়িং-এর ঘুম ভেঙে গেল।

ফকির বলল, 'উঠে পড়েছিস্ ? যা মুখে চোখে জল দিয়ে আয়, দেখি সে রকম প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায় কি না।'

কালী ঘোষালের গাড়ী সকাল থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে, ফেরে নি। ফড়িং উঠে, হাফ প্যান্টটা টেনে-টুনে, আগেই প্রাকৃতিক বেগ সামলাতে চলে যায়। ফকির ইষ্টিশনের দিকে তাকায়। এ গাড়িকে খুব বিশ্বাস নেই। একে ষ্টিম-এঞ্জিনের গাড়ি, তায় যাবে বীরভূমের দিকে। এদিককার প্যাসেঞ্জার এ-গাড়িতে কমই আসে।

সে যখন এসব ভাবছে, তখনই একটা রিকশা এসে দাঁড়াল তার সামনেই। যাত্রী যুবক দম্পতি। দেখে মনে হল, কাছে পিঠের কোন গ্রাম থেকেই এসেছে। বউটির চেহারায় রুগ্নতার ছাপ, চোখের কোল বসা, সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। পেটটা যে রকম বড় দেখাচ্ছে, গর্ভবতী বলেই মনে হল।

যুবক এসে ফকিরকে বলল, 'ভাড়া যাবেন তো ?'

'কোথায় যাবেন ?'

'জবাগ্রাম হাসপাতালে।'

'মাপ করবেন, জবাগ্রামে যেতে পারব না।'

এক কথায় নাকচ করে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে বিড়ি ধরাল ফকির। জবাগ্রামের যাত্রী সে বহন করে না, করবেও না।

যুবক অসহায়ভাবে বলল, 'দেখুন, আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ, যাবেন না কেন? ভাড়ার জন্যে ভাবছেন? আগাম দিয়ে দিচ্ছি।'

'না না, আগাম-টাগাম দরকার নেই মশাই, আমার গাড়ি জবাগ্রামে যাবে না।'

'কেন বলুন তো?'

যুবকটি আবার অসহায় উদ্বেগে ভেঙে পড়ে। ফকিরকেই জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করি বলুন তো। ওকে এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে একটা বিপদ আপদ ঘটে যেতে পারে।'

ফকির বিড়ি খেতে খেতেই জবাব দিল, 'কী বলব বলুন। আর একটা গাড়িও তো ইষ্টিশনে আছে, ভাড়া নিয়ে গেছে। দেখুন যদি এসে পড়ে।'

ঠিক সে সময়েই, ফকিরের পাশ থেকে, বেশ ভরাট আর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এল, 'কিন্তু আপনি যাবেন না কেন? এটা কি ভাড়া খাটবার গাড়ি নয়?'

ফকির বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, নতুন মানুষ। বয়সে যুবক, তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে। বড় বড় চোখ, চোখা, নাক, মুখ-খানি বেশ মিষ্টি। ডান দিকে টেরী কেটে চুল আঁচড়ানো বটে, তবে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বলেই একটু উসকো খুসকো হয়ে উঠেছে। ছিপছিপে নয়, দোহারাও নয়, এমনি গড়ন, লম্বায় ফকিরকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। যতই উসকো খুসকো দেখাক, গায়ের জামাটা দামী গরম পাঞ্জাবী বলেই মনে হচ্ছে। হাতা গুটানো। বাঁ-হাতের কব্জিতে ঝকঝকে ঘড়ি। পরনের ধুতিটা ফরাসডাঙার কাচির ধুতি, অথচ

পরেছে যেন আনাড়ি হাতে, ফেত্তা মেরে। পায়ের স্যাণ্ডেল দেখে মনে হল, ঠিক এ জিনিস ফকির আগে আর কখনো দেখেনি। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। সেটা চামড়ার না আর কিছুর, বোঝা যায় না, কিন্তু ভারী সুন্দর। হাতেও একখানি ব্যাগ, সেটিও বেশি দামী আর সুন্দর।

তা হোক, ফকির মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলল, কোথাকার মাল ইনি, ফকির চাটুয্যেকে কৈফিয়েৎ তলব করে? সে মুখ খুলে জবাব দিল, 'ভাড়ার গাড়ি বলে তো আর সকলের হুকুমবরদার নয়। যাব না বলে দিয়েছি, যাব না, যা করতে পারেন করুন গে।'

নতুন যুবকটি বলল, 'সে তো বনগাঁয় আপনারাই রাজা। আইন-কানুন সব আপনাদের হাতেই।'

ফকির খেঁকিয়ে উঠল, 'তার মানে শেয়াল রাজা বলেছেন আমাকে?'

যুবকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল। ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে দু একজন রিকশাওয়ালাও এসে ভিড় করেছে মজা দেখবার জন্যে। তারা নতুন যুবকটির দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখছিল।

যুবক বলল, 'আহা, আপনাকে শেয়াল রাজা বলব কেন, একটা কথার কথা বললাম আর কী। একে অরাজকতা বলে, বুঝলেন? দেখছেন ভদ্রলোক বউকে নিয়ে এরকম ছুটে আসছেন, স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছেন, এ সময়ে কি আপনার না বলা চলে? যে কারণই থাকুক, মানুষের একটা মায়া দয়া বলেও তো কথা আছে।'

যুবকের কথার সুরে ও যুক্তিতে এমন একটা কি ছিল, ফকির হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। একটু পরে সে সরে গিয়ে বলল, 'তা কী করব মশাই, আমি যাব না।'

যুবক বলল, 'ভাবুন তো আপনার স্ত্রীরই যদি আজ এমনি হত?'

ফকির বলল, 'হবে না।'

যুবক বলল, 'ও, সেই জন্যেই আপনার মনে লাগছে না? আপনার বোনেরও তো হতে পারত?'

ফকির কোন জবাব না দিয়ে চাঁপাগাছতলার দিকে সরে গেল। ফড়িং কিন্তু এই না যাওয়ার জেদে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। সে এমনভাবে বাবার দিকে তাকাল, যেন বাবা রাজী হলে ভাল হয়। তারা তো জবাগ্রামের হেলথ্ সেণ্টারে যাবে। মুখুজ্জেদের বাড়িতে তো নয়।

যুবক আবার জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া কত?'

ফকির বলল, 'ভাড়া তো মশাই আট টাকা। তাতে কী হয়েছে, বলে দিয়েছি যাবো না।'

যুবকটির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে দম্পতির দিকে একবার তাকাল। তারপরে বলল, 'টাকাতে অনেক সময় গোলমাল কেটে যায় কি না, তাই বলছি।'

ফকিরের ঠোঁট বেঁকে উঠল। বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে, দাদার মেলাই টাকা। একশ টাকা চাইলে, একশ টাকাই দিয়ে দেবেন?'

যুবকটি কোন চিন্তা না করেই বলল, 'তাতেও যদি আপনি যেতে রাজী থাকেন, আমি একশো টাকাই দিচ্ছি।'

ফকিরের কাছে কথাটা গালে থাপ্পড়ের মত লাগল। আট টাকার জায়গায় একশো টাকা দিতে চায়, এ কী রকম লোক। চোর বাটপাড় ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি? তাই সে অবাক হয়ে বলল, 'একশ টাকাই দেবেন?'

যুবক বলল, 'নিশ্চয়ই দেব, আপনি যদি যান।'

ফকিরের অবিশ্বাসী মন জেদ ধরে বসল। বলল, 'দিন তাহলে, আগাম টাকাটা দিন, আমি দেখি।'

যুবক হাতের ব্যাগটা খুলতে উদ্যত হয়েও, পকেটে হাত ঢোকাল।

কাগজের খর খর শব্দের মধ্যে, একটা নতুন একশো টাকার নোট বের করে ফকিরের দিকে এগিয়ে দিল। ফকির হাত বাড়িয়ে নোটটা নিল। কিন্তু চোখে তার সন্দেহ আরো তীব্র হল। এছশো টাকার নোট এ ফুলেরিতে এখনকার দিনে দুষ্প্রাপ্য নয়। বড় বড় দোকানে, আড়তে, ধানকলে, ইষ্টিশনে সব সময়েই দেখা যায়। তথাপি, আট টাকা ভাড়ার জায়গায় একটা অচেনা লোক একশো টাকা দিতে চায়। আর এক কথায় পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে দেয়, দেখলে সন্দেহ না করে পারা যায় না। ফকির পরিষ্কার বলল, 'ঘরে ছাপানো নোট নয় তো মশাই? চলবে তো?'

যুবকের মুখে হাসিটা লেগেই ছিল। বলল, 'দেখুন না, কোন দোকানে-টোকানে ভাঙানো যায় কী না। তাহলে ভাঙিয়ে দেখেই নিন।'

ফকির বলল, হ্যাঁ বাবা, যা দিনকাল, বিশ্বাস নেই। কত দেখলাম ওরকম।'

যুবক এবার একটু ধমকের সুরে বলল, 'বেশী কথা না বলে টাকাটা ভাঙিয়ে আনুন আগে। যে জন্যে আপনাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

ফকিরের সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ ফুটলেও সে কিছু বলতে পারল না। রাস্তার ওপরেই বড় কাপড়ের দোকানে সে নোটটা নিয়ে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই দশটা দশ টাকার নোট নিয়ে ফিরে এল। এসেই হাঁক দিল, 'ফড়িং, দরজাগুলো লাগা। কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন বললেন না তো?'

'আমিও জবাগ্রামেই যাব।'

যে যুবক তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল, সে সমস্ত ঘটনাটাকে প্রায় আষাঢ়ে গল্পের ঘটনার মত দেখছিল। এবার বলল, 'সত্যি আপনি লোকটাকে একশোটা টাকাই দিলেন?'

'দিলাম মশাই, কী আর করা যাবে। নিন, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে উঠে পড়ুন, আর দেরী করবেন না।'

'আপনার নামটা কী জানা হল না।'

'আমার নাম? আমার নাম—'

তার থতিয়ে যাওয়া দেখে ফকির দরজা জুড়তে জুড়তে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'নিজের নামটাই ভুলে গেলেই যে মশাই।'

যুবক হেসে তৎক্ষণাৎ বলল, 'আর যা আপনাদের সব ব্যাপার দেখছি, জন্মদাতার নামই ভুলে যাবার যোগাড়, তার আবার নিজের নাম।'

এই বলে, অন্য যুবকের দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম মনীশ চট্টোপাধ্যায়।'

ফকির বলে উঠল, 'চাটুয্যে' ?

মনীশ বলল, 'কেন, আপত্তি আছে ?

'না; আমার আবার আপত্তি কিসের। বামুনের পৈতে আছে তো ?'

আসলে মনীশকে নিয়ে ফকিরের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছে না। মনীশ বলল, 'না, ওটা আর রাখিনি। পদবীতেই পরিচয়, পৈতে রেখে কী করব।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে, ঠেস দিয়ে কথাটা বলল ফকির? যুবকের দিকে ফিরে বলল, 'নিন মশাই উঠে পড়ুন।'

যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে উঠে পড়ল পিছনে। তার স্ত্রীটি আসলে আসন্ন প্রসবা। কিংবা হয়তো, কয়েক দিন দেরী আছে। দেখে মনে হয়, অন্য কিছু অসুখ বিসুখও আছে।

ফকির ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল। মনীশও সামনের দরজা খুলে, সামনেই বসল। ফকির চোখ টেরে একবার তাকে দেখল।

লোকটাকে সে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ, কথাবার্তা চালচলনে যথেষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। সত্যি সত্যি একশোটা টাকা তো দিল। ডাকাত বা ফেরেববাজ বলেও চেহারায় মালুম দিচ্ছে না। লোকটা এল কোথা থেকে? হাওড়ার গাড়িতে যখন এসেছে, কলকাতা থেকে এসেছে নিশ্চয়। তবে বেশী ভেবেই বা কী হবে। টাকাটা পাওয়া নিয়ে কথা। কোন রকমে হাসপাতালের কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে আসা। কী আর হবে, না হয় বড় জোর মুখুজ্যে বাড়িতে খবর যাবে, ফকির জবাগ্রামে এসেছিল। যাক না, জবাগ্রাম তো কারুর কেনা জায়গা না। ফকির কোনদিন যাবে না বলেছিল, কিন্তু সেটা জবাগ্রামের কথা বলে নি, শ্বশুরবাড়ীর কথা বলেছিল। তবে, জবাগ্রামে তার যেতে ইচ্ছে করে না। এতগুলো টাকা হাতছাড়া হবে—তাই যাচ্ছে। সে মনীশের দিকে ফিরে বলল, 'দেখবেন মশাই, আগেই বলে দিচ্ছি জবাগ্রামের ভেতরে কিন্তু যেতে পারব না। হাসপাতাল অবধিই যাব।'

মনীশ বলল, 'বায়নাক্কা আপনার অনেক। নিন, এখন চলুন দেখি।'

ফকির চোখ পাকিয়ে একবার তাকাল। তারপরে বলল, 'ফড়িং হ্যাণ্ডেল মার্।'

কিন্তু ফড়িং-এর বাসনা, সে-ই গাড়ি চালাবে। বলল, 'তুমি চালাবে নাকি?'

'হ্যাঁ'।

'কেন, আমাকে দাও না।'

'যা বলছি কর। কাজের সময় ভ্যানতাড়া আমার ভাল লাগে না।'

মনীশ অবাক হয়ে ফড়িং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ আবার গাড়ি চালাতেও পারে নাকি?'

ফকির বলল, 'তা পারবে না কেন ?'

মনীশ হেসে বলল, 'আঁতুড়ঘরেই চালাতে শিখেছে বুঝি ?'

ফকির প্রায় ধমকে উঠল, 'তার মনে ? কী বলতে চান ? আঁতুড়ঘরে আবার কেউ গাড়ি চালাতে শেখে নাকি ?'

মনীশ একটুও বিচলিত না হয়ে হেসে বলল, 'না, খুবই ছেলে-মানুষ তো, তাই বলছি। শুনে আমার খুব ভাল লাগছে।'

ফকির সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল একবার। ফড়িং হ্যাণ্ডেল ঘোরাল। গুটিকয় পটকা ফাটার মত শব্দ করে গাড়িটা লাফিয়ে গর্জন করে উঠল। মনীশ বলল, 'আহ্, চমৎকার !'

ফকির আবার ভুরু কুঁচকে একবার মনীশকে দেখল। ফড়িং হ্যাণ্ডেলটা গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে মনীশের পাশে পাদানীতে উঠে দাঁড়াল। মনীশ বলল, 'খোকা, ভেতরে আসবে না ?'

'না।'

গাড়িটা একটা জান্তব চিৎকার করে, একটা লাফ দিয়ে, এবড়ো-থেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনের যুবক বলে উঠল, 'কাঁচা রাস্তাটা একটু আস্তে যান। বড্ড ঝাঁকুনি লাগছে।'

মনীশ, বলল, 'পাকা রাস্তায় এ গাড়িতে ঝাঁকুনি লাগবে না বলছেন ?

সে পিছন ফিরে যুবকের দিকে তাকাল। যুবক একটু হাসল। ফকিরের মেজাজ তাতে আরো চড়ল। যাও বা আস্তে চালাতো, এদের হাসি দেখে সে ইচ্ছে করেই জোরে চালাতে লাগল। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে খানিকটা এসেই জি· টি. রোড।

যন্ত্রের গর্জন তো নয়, যেন শুয়োরের চিৎকার। কত রকমের শব্দ যে বাজছে।

ষ্টেশন এলাকায় ইতিমধ্যে একটা গুঞ্জন ওঠে গিয়েছিল মনীশকে নিয়ে। লোকটা কে ? মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছিল, অথচ

ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। এক কথার একশো টাকা দেবার মত লোক, সেটাও বিস্ময়।

পিছনের সীট থেকে যুবকটি বলল, 'আচ্ছা মনীশবাবু, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো, মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে।'

মনীশ মুখ না ফিরিয়েই বলল, তা বলতে পারছি না। এদিকে তো আগে আসিনি। হয়তো অন্য কোথাও দেখে থাকবেন।'

এ সময়েই যুবকের স্ত্রী যেন তার স্বামীকে কী একটা বলল। যুবক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ, ওঁর চেহারাটা যেন অবিকল সুজনের মত। আমার মনে আসছিল, মুখে আসছিল না।'

মনীশ ফিরেও তাকাল না। যেন তার কানেই যায় নি। যুবক ডেকে বলল, 'বুঝলেন দাদা, আপনার চেহারাটা ঠিক সুজনকুমারের মত।'

মনীশ যেন অনিচ্ছায় বলল, 'কে সুজনকুমার?'

'সে কি, সুজনকুমারের নাম শোনেনে নি, বিখ্যাত নায়ক, রোমান্টিক হিরো।'

মনীশ বলল, 'তা হবে, ওসব জানি-টানি না। তবে অনেকে আমাকে একথা বলেছে।'

ফকির একবার মনীশকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমারও মনে হচ্ছিল, ছবি ছাপাতে এ রকম মুখ একটা দেখেছি। তা সে মাল কি আর ফুলেরিতে এভাবে আসবে?'

মনীশ বলল, 'মাল?'

'নয়? শালা যত ছোঁড়া-ছুঁড়িকে বখাচ্ছে, আর মাথা খাচ্ছে মশাই, ওই আপনাদের সুজনকুমার না কুজনকুমার। আমি ওসব দেখিও না, চিনিও না!'

মনীশ হেসে বলল, 'ভাগ্যিস্ আপনার মাথাটা খেতে পারে নি।'

ফকির বলল, 'ফকির চাটুয্যের মাথা খেতে হলে সুজনকুমারকে আর একবার জন্মাতে হবে, এ জন্মে হবে না।'

মনীশ বলল, 'বাব্বা।'

গাড়িটা এতক্ষণ চলছিল জি টি রোড ধরে উত্তরে। এবার বাঁদিকে বেঁকে একটা চওড়া কাঁচা রাস্তায় পড়ল।

মনীশের বুকটা একটু দুরু দুরু করছিল। অর্থাৎ সুজনকুমারের। বাঙলা দেশের বিখ্যাত নায়কের নামটা তাই। কিন্তু পিতৃদত্ত নামটা মনীশই বটে। সে মনে মনে ভাবল, যাক, আপাততঃ ফাঁড়াটা কেটেছে। সে তার দু চোখ মেলে দিল ধান কাটা মাঠের দিকে। মাঝে মাঝে গাছপালা রাস্তার ধারে। ভাল করে তাকিয়ে দেখবার উপায় নেই। নাকেও রুমাল চাপতে হয়েছে। ধুলো তো ঢুকছে না, যেন ফোয়ারার মত জল ঢুকছে। মাঘ মাস প্রায় শেষ। কাঁচা রাস্তায় পায়ের পাতা ডোবা ধুলো। গাড়ি আগাবার আগেই ধুলো উড়ে আসছে।

বর্ষায় জল যাবার জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট সাঁকো। গোরুর গাড়ি চলে চলে মাঝখানটা এত উঁচু হয়ে গিয়েছে. গাড়ি ঠেকে যাবার অবস্থা। তাই একটা চাকা সব সময়েই গরুর গাড়ির চাকার দাগে দাগে, নিচে, আর একটা ওপরে। ফলে, পাল খাটানো নৌকো যেমন একদিকে কাত হয়ে চলে, গাড়িও তেমনি চলেছে। তার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলানি তো আছেই।

তবু ভালো লাগছে মনীশের। সামনের রাস্তায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে শালিকের ধুলা-স্নান। একসঙ্গে অনেক চড়ুইয়ের ঝাঁক বেঁধে ওড়া। মাঠে এখনো মরা ধানের সন্ধানে চড়ুইয়ের সঙ্গে গ্রাম-বিবাগী পায়রারাও আছে। সূর্য চলে গিয়েছে, রোদটা বেশ মিষ্টি

লাগছে। আশেপাশের গ্রামে, গাছের পাতায় পাতায় রোদের ঝিলি-মিলি। মনীশের চোখে যেন স্বপ্ন নেমে আসছে। এই ধুলো, রোদ, আকাশ, গাছপালা, সমস্ত কিছুর মধ্যে সে যেন নতুন জীবনের নিবিড়তায় ডুবে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা অভাবিত, বিস্ময়কর। সুজনকুমার এরকম ভাবে চলেছে। কিন্তু মনীশের কাছে এটা অভাবিত বা বিস্ময়কর নয়; সে যেন নতুন করে বাঁচছে। এতক্ষণে নিশ্চয় তার খোঁজ-খবর পড়ে গিয়েছে। চারদিকে ছোটাছুটি, টেলিফোনে ডাকাডাকি চলেছে। যদিও সে তার সেক্রেটারির জন্য একটি চিঠি রেখে এসেছে, 'আমাকে খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই। আমি একলা একটু বাইরে যাচ্ছি। হ্যাণ্ডব্যাগের সমস্ত টাকাই আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমি যাদের সঙ্গে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ, তাঁরা হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আমি নিরুপায়। যেখানেই থাকি, সময় মত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এই চিঠিটা যেন খবরের কাগজে না যায়। তোমাকে যে যেকথাই জিজ্ঞেস করুক, তুমি শুধু একটি জবাবই দেবে, "তিনি বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, কিছু বলেন নি। কবে ফিরবেন, তাও আমাকে বলেন নি। সম্ভবতঃ তিনি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে কোথাও গেছেন।" এর বেশী না, এর কমও না। তুমি কোন রকম দুশ্চিন্তা করবে না।—ইতি।'

এই লিখে সে চলে এসেছে। নিজের দুটো গাড়ি আছে। বের করে নি। চাকরকে ট্যাক্সি ডাকতে বলেছে। কেবল মাত্র ব্যাকব্রাশ চুলটা ডান দিকে সিঁথি কেটে, সামনের দিকে টেনে দিয়েছে। ধুতিটাকে ফেত্তা দিয়ে পরে গরম পাঞ্জাবী চাপিয়েছে। চোখে সানগ্লাস দিয়েছে। তাতেই চেহারা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। মনীশ জানে, এই চেহারায় সে যদি খুব সচ্ছন্দে

চলাফেরা করতে পারে, শিল্পীজনোচিত মনোভাব নিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কোনরকম ভঙ্গি বা আচারণ না করে, হাওড়া ছাড়িয়ে চলে যেতে পারবে। তারপরে কোথাও নেমে পড়লেই হবে। দাঁত বের করে হাসা চলবে না! এই ভাবে সে সম্পূর্ণ বিপরিত পরিবেশে চলে যেতে চায়।

যেখানে তার ধ্যানভক্ত মোসাহেব ব্যবসায় অভিনয় নাটক শহর নাচ গান হোটেল ক্যাবারে ক্লাব মেয়েরা না থাকবে, এমন কোন যায়গায় যাবার জন্য সে বেরিয়েছে। জীবনটা কেবল অভিনয়, মঞ্চে অভিনয় করা হতে পারে না। অভিনয় অভিনয় অভিনয়। একটা ভারবাহী মেষের মত, আমার ঘাড়ে সারা দেশ অভিনয়ের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করে নি তাই রক্ষে তাহলে স্ত্রীও অভিনয় চাপিয়ে দিত আমার ওপর। অভিনয় অভিনয়; পেশার পরেও আমার আশেপাশে, সকলের সঙ্গে কেবল অভিনয়।

পেশার অভিনয় শেষ হলেই টাকার অভিনয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। রোমান্টিক জনপ্রিয় শিল্পীর অভিনয় ভক্তদের সঙ্গে, যে লোকগুলো আমার চারপাশে ঘোরে, তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্বের অভিনয়। মেয়েদের সঙ্গে অভিনয়। ভ্রমণে নাচে শয্যায়। প্রতিটি রাত্রের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যৌনতার খেলাতেও। মদ খাবার অভিনয়, মাতলামির অভিনয়। সুখী এবং অর্থবান ভদ্র অমায়িকতার অভিনয়। আমি শুধু নট, জনপ্রিয় নায়ক, তাই সকল উপচার আমার কাছে সব-কিছুর মধ্যে আমি অতি ভয়ংকর দুঃসহ মূর্তিমান অভিনয়ে মোড়া একজন অভিনেতা মাত্র।

আমি জানি, আমার চারপাশে মানুষের যে সমাজ, আমি সেই সমাজের একজন সামাজিক নই। ভিতরে বাইরে আমি কোথাও সামাজিক নই। কিন্তু আমি যে সমাজবোধসম্পন্ন মানুষ, সে কথাটাও আমাকে দাঁত বের করে বলতে হয়। সমাজ নিজেই আমাকে

অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমার জীবন-যাপন ভাবনা-চিন্তা কোন কিছুর সঙ্গেই এই সমাজের কোন যোগাযোগ নেই।

তথাপি এই সমাজ, প্রেক্ষাগৃহে আমাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা মেতে থাকে। তার বাইরেও, আমাকে নিয়ে কথা বলে। কাছে আসতে পারলে, আচরণের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছেলেরা গায়ের জামা পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারে। মেয়েরা প্রেম করে, যে কোন নিরালায় দেহ দান করতে পারে। গৃহস্থ কন্যা, বধূ, বারো-বাসরের মেয়ে সবাই। কিন্তু আমি জানি, তাদের জীবনের শোকে দুঃখে সংগ্রামে আনন্দে আমি কোথাও নেই। আমার জন্যে কোন বধূ সারাদিনের পরে ভাত নিয়ে বসে থাকে না, অথচ অনেক মহিলাই আমার জন্যে বসে থাকে, আমার একটু সান্নিধ্য, একটু স্পর্শ, একটু হাসির জন্য। কিন্তু তারা স্ত্রী নয়। তারা শুধু সুজন নামে একজন নায়কের পাশে মনে মনে নায়িকা। কাছে পেলে নায়িকার সবটুকু দিয়ে তার বিদায়। কিন্তু তারপরে সে যেখানে যাবে, সেটাই তার আসল জায়গা। এটা একটা গোপন মানসিকতা, আমাকে সে জয় করে নিয়েছে। সুজনকে সে জয় করেছে। হাসি পায়, দুঃখ হয়, লজ্জা করে। কিন্তু এতই এসব নিয়ে মত্ত হয়ে থাকি, দুঃখ বা লজ্জা পাবার অবকাশই বা আমার কোথায়?

কিন্তু পাই, হয়তো স্কচ হুইস্কির খোয়ারি কাটাবার মুহূর্তে, স্বপ্নে, অথবা নিতান্তই বাথরুমে, পুরনো স্মৃতিচারণের সময়। আয়নার সামনে নিজেকেই নগ্ন হয়ে দেখতে আমার মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, একটি মুখ স্মরণ করে। একটি দেহের ব্যাকুল ভঙ্গি-গুলোর কথা মনে করে।

কিন্তু ওরা কি কেউ আমাকে ভালবাসে? কেউ না। বুর্জোয়া পাতি-বুর্জোয়া এমন কি সামান্য বস্তিবাসিনী মেয়ে আর বেশ্যা,

সবরকমই আমি দেখেছি। এরা কেউ আমাকে ভালবাসে না। একজন নামকরা সুন্দরী যুবতীর কাছে যেমন সবাই সোনা টাকা জড়োয়া আর বাসনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যুবতীর যৌবন, আর বিগতযৌবনারা একটা বিকারের আকাঙ্খা নিয়ে আমার চারপাশে ঘোরে। একটা তাৎক্ষণিক আকাঙ্খা মিটিয়ে নেওয়া, সেটাই তাদের কাছে জয়।

আর আমার কাছে? চাই, কাউকে না কাউকে তো চাই, এস যাও! নগদ বিদায় যদি কিছু চাও, শৃঙ্গার মিলনের অধিক, তাও নিয়ে যেতে পার। কিন্তু ভালবাসা? কোথাও আছে আমার? 'যদি জানতেম, আমায় কিসের ব্যথা, তবে তোমায় জানাতাম।'........ এরকম গান গেয়ে বলতে ইচ্ছে করে। সত্যি, ভালবাসা বলে কি আমার কিছু জানতে নেই? অথচ জনমনে আমি কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে বসে আছি।

কিন্তু আমাকে দেখে কি কেউ কোনদিন ভাবতে পারে, আমিও এসব ভাবি। আমার মনে এসব চিন্তা পাক খেয়ে মরে। আর আমার সুন্দর হাসিটির পিছনে থাকে একটা ঠোঁট-বাঁকানো বক্রতা।

না, আমাকে এরা কেউ ভালবাসে না। মেয়েরা না, ছেলেরাও না। মেয়েরা ভাবে, উঃ লোকটার মেয়ের কোন অভাব নেই। এ ভাবনাটাই তাদের আরো কাছে আনে। আর ছেলেরা ভাবে, 'শালা, মেয়েদের চালিয়ে যাচ্ছে বটে।' ছেলেরা যারা আমাকে অনুকরণ করে, আমার মত চলে ফেরে, আমার অভিনয়ের ভঙ্গি করে কথা বলে, তারা হঠাৎ আমাকে রাস্তায় দেখতে পেলে চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে শালা সুজনকুমার যাচ্ছে মাইরি।' আরো দেখবার জন্যে হয়তো ছুটতেই আরম্ভ করে। একদিন যেমন একটা ছেলে, একটা ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'সুজনের গালে! মাইরি ও গালে

কত মেয়ে গাল ঘষেছে, ঠোঁট ঘষেছে।'...মেয়েদের উন্মাদনাও দেখেছি 'যেন উল্লাসে বিলাসে, নীবিবন্ধ পড়ে খসি।'...

এর নাম কি ভালবাসা? আমাকে নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তারা কি আমাকে ভালবাসে? আমার সঙ্গে যে সব নায়িকারা অভিনয় করে, তারা কি আমাকে ভালবাসে? কেউ না, আমি জানি।

আমি যতক্ষণ দীপশিখা হয়ে জ্বলছি, ততক্ষণ ব্যবসায়ী, মোসাহেব, ইয়ার বন্ধু এমন কি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা সকলেই সেই আলোকে ঝলকাচ্ছে। যখন আমি আর দীপশিখা হয়ে জ্বলব না, তখন সেই অন্ধকারে শূন্য হাঁড়িটাকে একটা নেড়িকুত্তাও এসে চাটবে না।

বাস্তবতার মধ্যে এই নিষ্ঠুরতা অবশ্যম্ভাবী কি না জানি না, কিন্তু এ নিষ্ঠুরতা আছে, আমি জানি। সেই জন্যেই বাস্তবের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাকৃত অলৌকিকতা আছে বলে আমি মনে করি। এবং সত্যি বলতে কি, আমার এভাবে চলে আসটাও তো তাই। বাস্তবই যে অপ্রাকৃত, এটা তারই প্রমাণ হচ্ছে।

কিন্তু আমি আর এভাবে থাকতে পারছিলাম না। তাই বেরিয়ে পড়েছি। আমি যে এর আগেও, অবকাশ যাপনের জন্য বেরোই নি, তা নয় কিন্তু সে তো প্রায় লাটসাহেবের সফর। তাতে অবকাশ যাপন হত না। প্রতিদিনের রুটিনের কাজের বাইরে, বাইরে কোথাও গিয়ে, আরো বেশী মদ্যপান, আরো বেশী হুল্লোড়, নাচ গান ফূর্তি সম্ভোগ হত। আর সেই খোয়ারি নিয়ে যখন কলকাতায় ফিরতে হত, তখন গা ম্যাজম্যাজ, শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌। তাজা হয়ে আসার বদলে আরো শিথিল শ্লথ। ডাক্তার প্রেসার দেখে বলত, উর্ধচাপের লক্ষণ। নিয়মিত জীবন যাপন, পরিমিত পান এবং ইত্যাদি চালাতে হবে। সেইসব অবকাশ যাপনের পরিণতি ছিল এই রকম।

তাই আমি এভাবে চলে এসেছি। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি কাউকে চমকে দিতে বা চমক সৃষ্টি করবার জন্যে বেরুইনি। আমি বেরিয়েছি আমার নিজের দায়ে। এতে হয়তো আমার অনেক ক্ষতি হবে। কিংবা হবে না। কিন্তু আমার নিজেকে একটা ভারবাহী পশু ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না। অভিনয়ের আর জনপ্রিয় অভিনেতার জীবনের যে সব ভার, তার জোয়ালটা নামিয়ে আমি স্বাধীনভাবে চরতে বেরিয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন বড় বড় কথাও ভাবছি না, জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছি। বা, জীবনটা শুকিয়ে যাচ্ছে একটু ভালবাসার অভাবে, অতএব ভালবাসার সন্ধানে বেরিয়েছি। সে সব কিছুই না। এ ভাবে জীবনকে সন্ধান করা যায় না। এভাবে কেউ ভালবাসার সন্ধানেও বেরোয় না।

আসলে এই যে রোমান্টিক নায়ক বলে পরিচিত হয়েছি, তার আগেও আমার একটা জীবনটা ছিল, যে-জীবনটা কলকাতার নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশের। সেখানেও আর আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। মা বাবা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। দাদারা আছেন। কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া, আমি আর কিছুই করি না। তাদের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগও নেই। কিন্তু কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশ ছাড়াও বাঙলা দেশে আরো অনেক পরিবেশ আছে। এই যেখানে আজ আমি এসেছি, বা আরো অন্য কোনখানে। যেখানে ফকির চাটুয্যের মত লোকেরা আছে। বলে, ওসব সুজনকুমার-টুমার নিয়ে তার কোনদিন মাথাব্যথা হয় না। বলে, ছেলেদের মাথা খাচ্ছে সুজনকুমার। এইসব লোকেদর মাঝখানে আমার ঘুরতে ইচ্ছা করছে। কিছুদিন এদের কাছে, এমনি বিশাল আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, গাছপালা পাখি, এইরকম একটি উদ্বাস্তু স্বামী, এরকম একটি গর্ভবতী ভীরু বউ অথচ

তার মধ্যেই স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমার চেহারাটা যার মত, তার নাম সুজনকুমার। আর ফড়িএর মত ছেলে, জামার বুকের বোতাম খোলা, পৈতাটা দেখা যায়, সেকালের গাড়ির ফুট-বোর্ডে দাঁড়িয়ে চলেছে, কপালের ওপর চুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এদের সঙ্গে এমন পরিবেশে আমার আসতে ইচ্ছে করছিল।

একটু মুক্তি, আর কিছুই না। কোন ভূমিকার কথা আমাকে মনে রাখতে হবে না, প্রতিটি রাত্রের বিষয়ে নেশাসক্তের মত, সন্ধ্যা থেকেই রক্তে বিষক্রিয়া শুরু হবে না। আসলে, লোকে যে রকম আমাকে সুখী মনে করে, এবং হয়তো ভাবেও আমার মত মানুষের আবার দায়দায়িত্ব কিসের, অথচ আমার এই যে জীবনটা, তার নিজস্ব দায়িত্ব যে অনেক, তা বোঝানো যাবে না, আমি এসবের বাইরে আসতে চেয়েছি। আমি আর অভিনেতা-জীবনের দায়িত্ব এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকতে পারছিলাম না। যে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাও যেন একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই পড়ে।…

ঘ্যাচ্ এবং ঘটাং একটা শব্দ হল। গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। মনীশের ভাবনাটা ভেঙ্গে গেল। দেখল, দুদিকে মাঠ। গাড়িটির সামনের দিকটা উঠে আছে একটা ঢিবির মত উঁচু জায়গায়, পিছন দিকটা ঢালুতে। ফকির চেঁচিয়ে বলল, 'ফড়িং হ্যাণ্ডেলটা মার্।'

ফড়িং হ্যাণ্ডেল মারতে গেল, আর ফকির মুখটা বিকৃত করে বলল, 'শালা গ্রাম-পঞ্চায়েত হয়েছে। মস্‌টে মস্‌টে টাকা মারবে, রাস্তায় মাটি ফেলবার নাম নেই।'

ফড়িং হ্যাণ্ডেল মারল, আবার গাড়ি গর্জন করল। ফকির আড়চোখে বারে বারেই মনীশকে দেখছিল। ভাবছিল জবাগ্রামে

লোকটা কাদের বাড়ি যাবে। কোনদিন তো লোকটাকে দেখেনি সে। নতুন জামাই নাকি কোন বাড়ির। পদবীতে চাটুয্যে, হবে হয়তো বাঁড়ুজ্যেদের বা মুখুজ্যেদের কোন বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। সব মিলিয়ে বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যে সাত-আট ঘর আছে জবাগ্রামে।

মনীশও সেটা লক্ষ্য করছিল। ভয় পাচ্ছিল, লোকটা চিনে ফেলবে কী না। এবং সেও, পিছনের ভাবনা ছেড়ে, আশু ভাবনা করছে। জবাগ্রামে গিয়ে কোথায় উঠবে সে। অচেনা লোককে গ্রামের মানুষ থাকতেই বা দেবে কেন।

গাড়িটা একটা পাশ দিয়ে উঁচু ঢিবিটা পার হল। ফকির পিছন ফিরে যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি হাসপাতাল থেকে আবার ফিরবেন এখন?'

যুবক বলল, 'না, আমার আত্মীয়বাড়ি আছে। কয়েকটা দিন সেখানেই থাকব।'

ফকির বলল, 'না বলছি, ফিরে গেলে ফুলেরিতে নিয়ে যেতাম।'

মনীশ ঠোঁটের কোণে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তার জন্যে রিটার্ন চার্জ কত দিতে হবে?'

ফকির প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'মানে? কী বলতে চান আপনি?

'বলছি ফিরে যাবার কোন ভাড়া লাগবে না?

'টাকাটা দিয়ে খুব মাথা কিনে নিয়েছেন, না?' আট টাকা কেটে, বিরানব্বই টাকা দিয়ে দেব আপনাকে। ফকির চাটুজ্যেকে আপনি টাকা দেখাবেন না'

'আহা টাকা দেখাব কেন? কী যে বলেন। বিরানব্বুই টাকা আপনার কাছে ফেরত চাইছে কে?

ফকির কোন জবাব দিল না। গাড়িটা তখন একটা বড় বাঁকে বাঁদিকে ঘুরছে। সামনেই একটা গ্রাম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাছ-গাছালির পাতা, শাদা রঙের একটা লম্বা একতালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

মনীশের মনে মনে হাসি, ফকিরকে তার ভাল লাগছে। তার মনে হচ্ছে, লোকটা মূলে সৎ। জবাগ্রামে না আসতে চাওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। বলছিল, গ্রামের মধ্যে সে ঢুকবে না। রাস্তার জন্যে না কি কেন রকম গোলমাল আছে, কে জানে।

রাস্তাটা গ্রামের কাছাকাছি এসে, বেশ চৌরস, এবড়োখেবড়ো নয়। ফকির গাড়িটা নিয়ে সোজা হাসপাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফড়িং দরজা খুলে দিল পিছনের। যুবক নামবার আগে বলল, 'মনীশবাবু, আপনি কাদের বাড়ি যাবেন?'

মনীষের বুকটা একবার ধ্বক্ করে উঠল। সে খুব অস্পষ্টভাবে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'এই যাব, একজনের কাছে আবার ফিরব এখুনি।'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—'

'তার কোন দরকার নেই, আপনি স্ত্রীকে নিয়ে আগে ডাক্তারের কাছে যান।'

মনীষের সঙ্গে একবার বউটির দৃষ্টি বিনিময় হল। রুগ্ন বড় বড় চোখ দুটিতে তার কৃতজ্ঞতা। একটু যেন কৌতূহলও রয়েছে। যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে নেমে গেল।

ফকির দেখল, মনীশের নামবার কোন লক্ষণ নেই। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ফড়িং ডাকল, 'বাবা।'

'বল।'

'একবারটি যাব?'

ফড়িং মায়ের কাছে যেতে চাইছে। ফকির এটা আগেই অনুমান করেছিল। গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে মুখুজ্যেদের বাড়ি। যেতে আসতে কথা বলতে, কোন না আধঘণ্টা কেটে যাবে? তবে জবা গ্রামে এসে, মাকে না দেখেই বা ফড়িং যায় কী করে। সে বলল, 'সে তো জানিই যেতে চাইবি।'

'যদি না যাই, আর মা জানতে পারে জবাগ্রামে এসেছিলাম, তা হলে মায়ের খুব কষ্ট হবে।'

ফকির বলল, 'যা কিন্তু দেরী করিস্ নে। গাড়িটা নিয়ে আমি বটতলায় অপেক্ষা করব।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফড়িং এক দৌড়। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'ও ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল মানে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো?'

এ রকম অনধিকার চর্চায় ফকির একটু বিরক্ত হল। শুধু বলল, 'হ্যাঁ'।

'আপনি যাবেন না?'

'না।'

'সে কি মশাই, মানে ব্যাপারটা—।'

'কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন? আপনি তো নামছেন না।'

মনীশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেও সামলে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এ গ্রামে কোন ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?'

এবার ফকিরের ভুরু কুঁচকে উঠল। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সে অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে? জবাগ্রামে আপনি ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এই আর কি, যদি পাওয়া যেত, তবে থাকতাম।'

ফকির কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। কী বলতে চায় লোকটা? ঠাট্টা করছে, নাকি ফেরেব্‌বাজী করছে? যেভাবে এল, তাতে মনে হয়েছিল, এরও নিশ্চয় কোন জরুরি প্রয়োজন আছে জবাগ্রামে। জিজ্ঞেস করল, 'জবাগ্রামে আপনার কেউ নেই?

মনীশ এবার অনেকটা নির্বিকার ভাবে বলল, 'না তো।'

'তবে এলেন কেন?'

'এমনি। ভাবলাম, ওই ভদ্রলোকের হাসপাতালে আসা দরকার। আমারও একটু ঘোরা হবে। চলুন না, কোন বটতলায় যাবেন বলেছিলেন সেখানেই যাই।

ফকিরের তখন নানারকম সন্দেহে বুদ্ধি ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে আসছেন আপনি?'

'কলকাতা।'

'কি জন্য?'

'এমনি বেরিয়ে পড়লাম।'

তার মানে কী। লোকটার মাথা খারাপ নয় তো? মনীশ ফকিরের অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। সে মনে স্থির করে নিল, এ লোকটাকে সব কথা বলতে পারলে ভাল হয়। তা হলে, একটা সঙ্গী জুটবে, বেড়ানোও যাবে। লোকটা ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরিচয় পেয়ে পাগলামি না করলেই হল। সে খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'ফকিরবাবু। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে।'

ফকির সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'কী কথা?'

হাসপাতালের সামনে খোলা জায়গায় কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। একটি নার্সকে সামনের বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা গেল কয়েকবার। ঝাড়ুদার বা অন্যান্য কর্মচারী নিজেদের কাজে ব্যস্ত। গাড়িটার দিকে কারুর লক্ষ্য নেই।

মনীশ বলল, 'আমার আর একটা নাম আছে।'

'কী?'

'সুজনকুমার।'

'অ্যাঁ?

মনীশ সংক্ষেপে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার সব কথা ফকিরকে বলে ফেলল।

আর ফকিরের মুখটা কখনো গোল হল, লম্বা হল। তারপরে শুধু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মনীশ বলল, 'তবে আপনার মাথা আমি খাব না। সত্যি বলছি।'

ফকির একবার ভুরু কোঁচকালো, তারপরে থ্যাক করে হেসে বললে, 'ওটা তো ঠিক মনে আছে? আমার মাথা খাওয়া তোমার—মানে, আপনার কম্মো নয়।'

মনীশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে তুমি'ই বলুন।'

'তাই কী হয়? অতবড় একটা লোক।'

'কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন, সুজনকুমার খারাপ, ছেলে-মেয়েদের মাথা খায়, তাকে আপনি বড় ভাবেন না। আর সত্যি আমি সে হিসেবে বড়ও নই।'

'না বাবা, তার ওপরে বড়লোক মানুষ, এমনি করে তুমি বলা যায় না।'

মনীশ বলল, অনুরোধটা রাখুন না ফকিরদা।'

'ফকিরদা!'

'বলব না?'

ফকির মনীশের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বেশ, তাই বলবে। তাহলে আমিও তুমি বলব। কিন্তু সত্যি করে বল তো কেন এভাবে বেরিয়ে পড়েছ? তোমাদের কথা কিছু বলা যায় না বাপু। কিছু গোলমাল কেলেংকারি করে পালিয়ে আসনি তো?'

মনীশ মনে মনে হাসল, বলল, 'বিশ্বাস করুন, গোলমাল কিছুই নেই। আমার আর ভাল লাগছিল না, যে কথা আপনাকে বললাম।'

ফকির বলল, 'তা বেশ করেছ। কিন্তু বাবা তোমার এই টাকা নিয়ে যাও। তুমি খুব ঘুঘু ছেলে। এত যার নামডাক, সে কিনা এভাবে বেরিয়ে পড়ে?'

মনীশ বলল, 'আচ্ছা ফকিরদা, সত্যি বলুন তো, আমার নামডাকে আপনার কিছু যায় আসে?'

'আহা, আমার আবার কী যাবে আসবে। পৃথিবীতে কত ব্যাপার ঘটছে, কত মানুষ আছে, তার জন্য আমার কী যাবে আসবে। গরীব মানুষ, ওই গাড়িটা চালিয়ে কোনরকমে চলে। আর ঘর বাড়ি আছে, ভাঙাচোরা। তবে তোমায় কে না জানে বল। সিনেমা-থিয়েটার দেখিনা বটে, তোমার নামটা ঠিক জানি, ছবিও অনেক দেখেছি। তা সে বইপত্তরেই বল আর দেয়ালেই বল। কিন্তু আজ তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে। কিন্তু টাকাটা—।

মনীশ বলল, 'কেন টাকার জন্যে এরকম করছেন। যদি দিতেই হয়, দেবার সময় অনেক পাবেন। আপনি বরং আমার এ ব্যাগটা রাখুন।'

বলে সে হাতের ব্যাগটা ফকিরের দিকে এগিয়ে দিল। ফকির জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে এতে?'

'দেখুন না খুলে।'

হাতব্যাগ হিসাবে বেশ বড়ই, সুদৃশ্য কালো রঙের ব্যাগ। ব্যাগটা খুলেই ফকির ঝপ্ করে বন্ধ করে ফেলল। যেন সাপ দেখেছে, এমনি ভাবে ব্যাগটা মনীশের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, "না বাবা, এ আমি রাখতে পারবো না, বাবা রে, এত টাকা! কত টাকা আছে ওখানে?

মনীশ বলল, 'ষাট সত্তর হাজার টাকা আছে।'

'তব্বে? উরে বাবা, তোমার মাথা খারাপ, শালা জীবনে একসঙ্গে অত টাকা দেখি নি।'

মনীশ জানে, ফকিরের কথার মধ্যে কোন মিথ্যে নেই। এতগুলো

টাকা আছে, এ কথাটা হঠাৎ জানানোর ব্যাপারে তার মনে যে কোন দ্বিধা নেই, তাও সত্যি নয়। কিন্তু ফকিরকে মানুষ হিসাবে তার ভালই লাগছে। বলল, 'সেইজন্যেই তো ব্যাগটা আপনার কাছে থাকা ভাল ফকিরদা। কেউ ভাবতেই পারবে না, আপনার কাছে এত টাকা আছে।'

ফকির বলল, 'না না বাপু, তোমার তা বলে এত টাকা নিয়ে বেরুনো ঠিক হয় নি। ষাট হাজার বা সত্তর হাজার, সেটাও তুমি জান না, মাঝখানে দশ হাজার টাকাটা কিছুই নয়? তোমরা লোক সুবিধের নও বাপু।'

মনীশ বলল, 'ঠিক বলেছেন দাদা, লোক সুবিধের নই। কিন্তু এ টাকা আপনারাই আমাদের দিয়েছেন। আপনি ব্যাগটা রাখুন।

'আচ্ছা আমি রাখব পরে। এখন তুমি রাখ। তুমি বাপু আমাকে একটা ভয় ধরিয়ে দিলে। কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?'

'কেন আপনাদের এখানেই। আপত্তি আছে?'

'আমাদের এখানে মানে?'

'এই গ্রামে, মানে এই জবাগ্রামে?'

'এটা কি আমার গ্রাম। এটা তো আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ।'

'ও তাই বুঝি ফড়িং বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কেন গেলেন না তাহলে?'

'ওই মুখুজ্জেবাড়িতে আমি যাই না। জবাগ্রামে তো আমি সেই জন্যেই আসতে চাই নি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল মনীশ, কেন ফকির আসতে রাজী হচ্ছিল না। ফকির আবার বলল, 'তুমি কি ভাবছিলে, আমি এমনি চশমখোর ওরকম অবস্থায় একটা মেয়েছেলেকে দেখেও আসতে চাইছিলাম না? মনে মনে ইচ্ছে করছিল ঠিকই। তারপরে তুমি এসে হাজির

হলে, একশো টাকার নোট দেখিয়ে বেশ খেলা দেখালে। আমি আর পেছুতে পারলাম না।

'চমৎকার!'

মনীশ হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু দাদা শ্বশুরবাড়ী যান না কেন? ঝগড়া?'

'ঝগড়া?'

বলে ফকির চাটুজ্যে এক লহমায় সব ফিরিস্তি দিয়ে ফেলল। তবে মনীশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দাদা, আমরা লোক ভাল নই সত্যি, কিন্তু আপনি বৌদির প্রতি খুব অন্যায় করেছেন। বাঙলা দেশে এখনো এমন মহিলা আছেন. জানতুম না।'

ফকির গম্ভীর হয়ে বলল, 'কী রকম?'

'স্বামীর অপমানের পর যে বলতে পারে, তুমি না নিয়ে গেলে যাব না।'

'আরে রাখ, ওসব বড়লোকি মেজাজ আমি জানি।'

'আপনি তো বড়লোক নন, আপনার কিসের মেজাজ?

'আমি অপমানিত হয়েছি।'

'বৌদিকেও আপনি করেছেন।'

অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। বৌদি কী দুঃখে আছেন, সেটা ভাবতে পারেন?'

অ্যাঁ? শুনেছি বটে, শরীরটা ক্রমেই খারাপ হয়ে গেছে…।'

'খুব অন্যায় দাদা, এটা ঠিক করেন নি।'

ফকির সন্দিগ্ধ চোখে মনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ, এই তো বাবা তুমি আমার মাথা খাচ্ছ?'

মনীশ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'সত্যি এমন মাথা খেতে পারলে ভাল।'

ফকির মুখখানা গম্ভীর করে বলল, 'বটে? যাকগে, এখন বল

দিকিনি বাছা, তুমি কোথায় যাবে ? কী তোমার মতলব ?'

'বলেছি তো দাদা, যেখান থেকে এলাম ঠিক তার উল্‌টো দিকে। এরকম একটা পাড়াগাঁয়ে। যেখানে লোক নিজের মনে—।'

ফকির তিক্ত হেসে বলল, 'নিজের মনে, পরের পেছনে কাটি দেয়, এর তার কুচ্ছো করে, খিদেয় মরে, মরাইয়ে ধান নেই, তার ওপরে তাড়ি গিলে পড়ে থাকে, খাবার দাবার বলতে সেখানে কিছু নেই, দুটো কাঁচকলা পেতে হলেও গ্রাম তোলপাড়, সব শহরে গিয়ে বিকিয়ে বসে আছে… ।'

মনীশ অবাক হয়ে শুনল। বলল, 'এরকম অবস্থা ?

'তবে কি রামরাজত্ব ভেবেছ নাকি ? সে তো বাবা তোমাদের কলকেত্যাটিকেই করে রেখেছ। যত টাকা সেখানে, শালা বাঘের দুধও সেখানে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ একেবারে উল্‌টো জায়গায় এসে পড়েছ, সন্দেহ নেই। যত খুশি মাঠ ঘাট বন বাদাড় চষে বেড়াও, এঁদো পুকুর জোড়া পুকুর যত খুশি দেখতে পার। খেতে চেয়ো না। খেতে পাবে, অষ্ট তোমার বেড়াল ডিঙোতে পারবে না, এত ভাত, ডাল আলু কুমড়ো…।'

শুনতে শুনতে মনীশের নিজের খাদ্য তালিকায় চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। অথচ, এমন গ্রামীণ নায়কের ভূমিকায়ও সে নাকি সার্থক অভিনয় করেছে। এমন না হলে আর নাটক, অভিনয়, অভিনেতা, নাট্যকার কাকে বলে। সে বলল, 'তা হলে এই নিয়েই কাটাই কিছুদিন।'

'কোথায় কাটাবে ?'

'যেখানে বলবেন, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন ?'

'আমি ? আমাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।'

'গাড়িটা তো এখন আমিই ভাড়া নিয়েছি।'

'তুমি ?'

হ্যাঁ, সারা দিন রাত্রির জন্য ভাড়া। আগাম কিছু চান—।'

'থামো হে ছোকরা—।'

ধমক দিয়েই ফকির থেমে বলল, 'দেখো বাবা, রাগটাগ করো না। তোমরা হলে অনেক— ।'

'বড় মানুষ, বলুন না। তা হলে আর দাদা ভাই থাকছি কেমন করে ।'

'তাও তো বটে ।'

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এল ফড়িং। বলল, বাবা তুমি বট-তলায় যাও নি গাড়ি নিয়ে? আমি সেখান থেকে ঘুরে এলাম।'

ফকির বলল, 'যাব কি বাবা, এখানে যে সঙের খেলা লেগেছে। তুই দেখা করে এসেছিস ?

'এসেছি।'

কিন্তু এতক্ষণে ফকিরের লক্ষ্য পড়ে, ফড়িং-এর মুখটা এর মধ্যেই শুকিয়ে উঠেছে। চোখে যেন জলের আভাস। কেন, মামারা কিছু বলেছে নিশ্চয়। এমন চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে আছে ফড়িং। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে ফড়িং ?'

ফড়িং-এর গলাটা নিচু শোনাল, করুণ সুরে বলল, মা তোমাকে একবারটি ডাকছে ।'

ফকির অবাক হয়ে বলল, 'তোর মা আমাকে ডাকছে ?'

'হ্যাঁ। মার রোজই এখন জ্বর হচ্ছে। শরীরটা ভাল না। আমাকে বললে, 'তোর বাবা যখন এতদিন বাদে জবাগ্রামে এসেছে তখন একবারটি আসতে বল। তার ইচ্ছে না হয়, এ বাড়িতে আসতে বলব না। বাড়ির পশ্চিমের পোড়ো মন্দিরের কাছে তো গাড়ি আসে, সেখানেই একটু আসতে বলিস। একটিবার চোখে দেখে রাখব ! আবার কবে আসবে ! আর হয় তো দেখা হবে না কোনদিন…।'

মায়ের জবানী শেষ করতে পারল না ফড়িং। ওর গলার স্বর বন্ধ

হয়ে গেল। চোখে জল এসে পড়ল। বলল, 'তুমি একবারটি যাবে বাবা ?'

ফকিরের মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাবের সঙ্গে বিরক্তি। ভুরু কুঁচকে মনীশের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখোতো কী ঝামেলায় পড়লাম। তোমার জন্যেই আজ আমার—।'

মনীশ বলল, 'কোন কথা না বলে গাড়িতে ষ্টার্ট দিন দাদা।'

ফড়িং একটু অবাক হল ফকির আর মনীশের কথার ধরনে।

ফকির প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'ষ্টার্ট দেবো মানে ?'

'পশ্চিমের পোড়ো বাড়িটার কাছে বউদি অপেক্ষা করছেন, সেখানে যেতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সুযোগ আর পাবেন না ফকিরদা।'

ফকির চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ফকির চাটুয্যে কোন পাপ করে না।'

'কিন্তু এই অবস্থায় আপনি ফিরে যাবেন ফকির দা ? বউদিকে কি আপনি একটুও ভালবাসেন না ?'

ফকির ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। মনীশ আবার বলল, 'বউদির কথাটা ভাবুন, আপনাকে একবার দেখতে চান খালি। না হয় মিছিমিছিই চলুন !'

ফড়িং এর খুব ভাল লাগল মনীশকে। সে আবার বলল, 'বাবা, একবারটি চল।'

ফকির প্রায় নিরুপায় বোধ করল। তা ছাড়া আসলে তার মনটাও কেমন করছিল। তথাপি সে মুখটা ভয়ংকর করে বলল 'শালা জবাগ্রামে আসাটাই আজ ভুল হয়েছে। নে ফড়িং হ্যাণ্ডেল মার।'

মনীশ দরজা খুলে নামবার উদ্যোগ করল। ফকির খেঁকিয়ে উঠল, 'আবার নামছ কোথায় ?'

'আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে এ সময়ে ?'

'আর ন্যাকামো করতে হবে না, চুপ করে বসো।'

মনীশের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। বলল, 'তা হলে দাদা, বউদির কাছে আমার পরিচয়টা আপনার ভাই বলেই দেবেন। মানে, আমার ব্যাপারটা মিছিমিছিই।'

ফকির বলল, 'অই মিছিমিছির কারবারই তো বরাবর করে এলে।'

মনীশ বলল, 'যা বলেছেন দাদা। শোন ফড়িং, আমি এখন তোমার কাকা।' ফড়িং কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, 'মিছিমিছি তো?'

মনীশ অবাক হয়ে হাসল, বলল, 'না, তোমার সঙ্গে মিছিমিছি নয়।

জবাগ্রামের এক অংশকে সচকিত করে দিয়ে, গাছপালা ঘেরা দু'তিনটে বড় বড় ঢিবি ঢেউয়ের মত পেরিয়ে, মন্দিরের পোড়োয় এসে যখন ফকিরের গাড়ি দাঁড়াল, তখন পশ্চিমের আকাশে রোদ ঢল খাওয়া, গাছপালার মগ ডালে রক্তিম রোদের ঝিলিমিলি। গাড়িটা থেমে যেতে সব যেন নিঝুম মনে হল। থেকে থেকে পাখির ডাক শোনা যায়।

শিব মন্দিরটা জীর্ণ, তলায় ক্ষয় ধরেছে। এখানে সেখানে গা থেকে ইঁট খসেছে। শ্যাওলা ধরেছে গোটা গায়ে, অশত্থের চারা মাথা তুলেছে কয়েকটা। পিছনে গাছপালার ফাঁকে দেখা যায় একটা দোতলা লাল রঙের বাড়ি।

গাড়িটা পোড়োয় দাঁড়াতেই ফড়িং নেমে দৌড়ে গেল মন্দিরের পিছনে। ফকির নেমে দাঁড়াল গাড়ি থেকে। মনীশ দেখল, মন্দিরের পিছন দিক থেকে প্রায় বছর তিরিশের এক স্ত্রীলোক ফড়িং-এর পাশে বেরিয়ে এল। ফরসা রঙে কিছু কালিমার আভাস, শীর্ণ, মাথায় মাঝামাঝি ঘোমটা টানা।

কিন্তু মুখখানি সত্যি সুন্দর, বড় চোখ, টিকলো নাক। শরীরের গড়ন দেখলে বোঝা যায়, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চেহারাটা অপরূপ দেখাত।

ফকির কয়েক পা এগিয়ে গেল। সুষমার গাড়ির দিকে লক্ষ্য পড়ল না। সে ফকিরের দিকে একবার তাকিয়ে, নিচু হয়ে তাকে প্রণাম করল। ফকিরের মনটা কেমন দুলে উঠলো, মোচড় খেল। বলল, 'থাক না এ সব। কেমন আছ?'

সুষমা ফকিরের দিকে তাকাল। ফকির সেই চোখে যেন চোখ রাখতে পারছে না। সুষমা বলল, 'ভাল আছি। তুমি ভাল তো?

এ সময়ে মনীশ নেমে এল। তাকে দেখেই সুষমা মস্ত বড় একটা ঘোমটা টেনে দিল। ফকির বলল, 'আমার ভাই সুজ-ম-ম-মনীশ চাটুজ্জে।'

মনীশ একেবারে নিচু হয়ে সুষমার পায়ের কাছ হাত দিয়ে বলল, 'কেমন আছেন বৌদি?'

সুষমা দুর্বল শরীরে কোনরকমে একটা হাত বাড়িয়ে একটু সরে গেল। কোন কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপচাপ। ফকির তার নিজস্ব গলা খুলল, 'ভাল যা আছ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাপের ভিটেয় পড়ে থেকে মরেও তোমার সুখ।'

মনীশ বলল, 'আহ ফকিরদা এ সব কথা—।'

তার আগেই সুষমার গলা শোনা গেল, 'তুমি তো তাই চেয়েছ।'

'আমি চেয়েছি?'

'চাও নি? তা নইলে, একবারও তো এলে না আমাকে নিতে?

'এ সব জেদবাজী আমাকে দেখিও না।' ফকির চিৎকার লাগাল, 'নিজে ইচ্ছে করে বাপের বাড়িতে রইলে, বাপ ভায়ের আদর সোহাগ নিয়ে—'

তার কথা শেষ হল না, সুষমা কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। এ সময়েই, আঠারো উনিশ বছরের একটি

স্বাস্থ্যবতী ফরসা মেয়ে মন্দিরের পিছন থেকে এদিকে এল। সুষমার দিকে দেখে বলে উঠল, 'বড়দির কী হল?'

ফড়িং বলল, 'দেখ না মাসী, মা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।'

মনীশ প্রায় ধমকের স্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে দেখছেন কি ফকিরদা, বউদি অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি তুলুন।'

ফকির ভয়ে ও বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

'তুলুন তাড়াতাড়ি। তুলে বাড়িতে নিয়ে চলুন।'

ফকির আর কিছু ভাবতে পারল না। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সুষমাকে বুকের কাছে তুলে নিল। সুষমার কোন চৈতন্য নেই। ফকির ডাকল, 'শুনছ?'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ফকির আবার বলল, 'ইস জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলিমা, চল্ তোর দিদিকে বাড়িতে দিয়ে আসি।'

নীলিমা সেই মেয়েটি, যাকে ফড়িং মাসি বলছিল, তার চোখে মুখে বিস্ময়। অনেকটা সুষমার মতই দেখতে। বয়সটা অনেক কম এবং স্বাস্থ্যটা ভাল বলে, মনে হচ্ছিল, একটি রৌদ্র কিরণের ছটা লাগা টলটলানো ঝর্ণার মত। সে ব্যাপারটা কিছুটা ধরতে পারছিল না, হঠাৎ শিব-মন্দিরের পোড়োয় এরকম সমাবেশ হল কী করে। সে কেবল বলল, 'নিয়ে এস বাড়িতে খবর দিচ্ছি।'

যাবার আগে সে মনীশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে গেল। অপরিচয়ের কৌতূহলিত অনুসন্ধিৎসা।

সুষমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বাড়িতে ঢোক আগেই, দরজায় শাশুড়ি দেখা দিলেম। তাঁর চোখে মুখে শঙ্কিত উৎকণ্ঠা। জিজ্ঞেস করলেন, 'পুষি বেরুল কখন বাড়ি থেকে? ওর তো জ্বর।'

ফকির, সতী বুকে শিবের মত বলল, মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছল।'

সবাই ঢুকে গেল বাড়িতে। মনীশ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে

রইল। সেটা লক্ষ্য পড়ল নীলিমার। সে ফড়িংকে বলল, 'ফড়িং ওঁকে ডাক।'

ফড়িং ফিরে বলল, 'কাকা এস।'

মনীশ বাড়িতে ঢুকল। সুষমার দাদারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। যে ঘরে সুষমাকে নিয়ে যাওয়া হল, সবাই সেই ঘরে এল। সুষমার দাদারা বারে বারেই মনীশের দিকে দেখছিল। তাদের ভগ্নিপতি ফকির চাটুয্যের সঙ্গে, বোধহয় মনীশকে ঠিক মেলাতে পারছিল না। মনীশ আশা করেছিল, সুষমার দাদারা নিজেরাই ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু নিরীহ গ্রামীণ ভদ্রলোকেরা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে রইল। অথচ, সুষমার অবস্থা দেখে মনীশ আর চুপ করে থাকছে না। সুষমার দাদাদের দিকে ফিরে মনীশ বলল, আপনারা বোধহয় বউদির দাদা?'

বড় দাদা শিবনাথ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকতে পারেন? গ্রামে ভাল ডাক্তার আছে?

'ভাল মানে, হরিপদ ডাক্তার আছে। পাশ-টাশ নয়—তবে সে-ই দেখছিল।'

মনীশের এখন কোন সংকোচ নেই। বলল, 'দেখে তো এই হাল করেছে। আর ভাল ডাক্তার কেউ নেই?'

'আছে, হাসপাতালে ভাল ডাক্তার আছে, আসতে চায় না।'

'আসতে চায় না? বেশ, আমি দেখছি। ফড়িং তুমি আমার সঙ্গে এস।'

ফড়িংকে নিয়ে সে মন্দিরের পোড়ো থেকে গাড়িটা নিজেই চালিয়ে চলল।

ফড়িং অবাক হয়ে বলল, 'তুমি গাড়ি চালাতে পার?

মনীশ মুচকি হেসে বলল, 'একটু একটু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হল। ডক্টরস্ রুমের কাছে গিয়ে দেখল, তালা বন্ধ। মনীশ দেখল, সামনে একটা ওয়ার্ড, পুরুষ সেখানে কেউ নেই, সবই মেয়ে। সমস্ত ওয়ার্ডের চেহারাটা এমন হতভাগা যেন এরা রুগী নয়, সব ভিখিরি। একটু আগে যে-বউটির জন্য, ফুলেরি থেকে এখানে আসতে হল, সে আর তার স্বামীই-বা গেল কোথায়! বউটির অবস্থা তো তেমন ভাল না, তাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের দেখা দরকার।

সামনের বারান্দা ঘুরে গিয়ে, পিছনে যাবার পথে, দেখা গেল একটি মেয়ে আসছে শাদা এ্যাপ্রন পরে। তাহলে নার্স আছে। সেটাও ভাগ্য, এ গ্রামের পক্ষে। নার্সটিকে দেখেও গ্রামের মেয়ে বলেই মনে হয়। সে মনীশকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে তার বিস্মিত কৌতূহল। মনীশ মনে মনে হাসলেও, সাবধান হল। সে-ই আগে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানকার নার্স?

নার্স ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ'।

'আপনাদের ডাক্তারবাবু কোথায়?

'রুগী দেখছেন।'

'কোথায়?'

'যেখানে রুগীদের দেখা হয়। আপনি যাবেন সেখানে?

'যেতে চাই।

'আসুন।'

মেয়েটি যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরল। কিন্তু তার চোখে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়েছে। কয়েক পা গিয়েই, নার্স হঠাৎ ফিরল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মনীশ প্রমাদ গণল, তবু বলল, 'নিশ্চয়ই'।

'আপনার নাম কী?'

'মনীশ।'

'মনীশ? ঠিক বলছেন?'

মনীশ হাসল, রীতিমত অভিনয় করে করে বলল, 'নিজের নাম আবার কেউ মিথ্যে বলে নাকি?'

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, তা নয়, কিন্তু ভারী আশ্চর্য তো!

মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

মেয়েটি আবার লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি আর কেউ।'

মনীশ নির্বিকার ভাব করে বলল, আপনার চেনাশোনা কেউ?'

'শুধু আমার চেনা কেন, সারা দেশের লোকই তাকে চেনে, তার নাম সুজনকুমার।'

আসল সুজনকুমারের চোখে দেখা দিল স্মৃতি হাতড়ানো ভ্রূকুটি। তারপরে চোখ বড় করে বলল, 'ও, আপনি অভিনেতা সুজনকুমারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার চেহারাটি ঠিক যেন তার মত।'

মনীশ একটু হাসল। মনে মনে সে ঠিক খুশি হতে পারছে না, দূর পাড়াগাঁয়ের হাসপাতালের একটি সেবিকাকে এভাবে ঠকিয়ে—কিন্তু সে নিরুপায়। বলল, 'তা হবে হয় তো।'

নার্সটি বলল, 'এমন কি, আপনার গলার স্বর পর্যন্ত।'

'সত্যি?'

এর বেশী উৎসাহ দেখাতে আর সাহস পেল না মনীশ। নার্স একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে দেখা গেল, সেই যুবক স্বামীটিকে। ঘরের সামনে একটি পর্দা ঝুলছে, দেখে মনে হল, পুরনো বালিশের খোল ঝুলছে। যুবক অবাক হবে জিজ্ঞেস করল, 'এ কি আপনি এখানে?'

মনীশ বলল, 'ডাক্তারবাবুকে ডাকতে এসেছি।'

'আপনার কিছু হয়েছে নাকি?

'না, আমার বউদির।'

যুবকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল।

আপনার বউদি কি এই গ্রামে থাকেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

যুবক কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে, হঠাৎ একটু হাসল। বলল, 'আসলে মোটরওয়ালাকে আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন না, তাই, তো?'

মনীশ ফড়িং-এর মুখের দিকে একবার দেখে বলল, 'মানে ফকিরদার কথা বলছেন তো? উনি আমার সম্পর্কে দাদা।'

'আপনার সম্পর্কে দাদা?'

'হ্যাঁ। কখনো দেখাশোনা হয় নি তো। এখন দাদার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, কথা বলতে বলতে পরিচয় বেরিয়ে গেল।'

যুবক অবাক খুশিতে বলল 'বাহ্ ভারী মজা তো!

মনীশ গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্ত্রীকে দেখেছেন ডাক্তারবাবু?'

যুবক ক্ষুব্ধ গাম্ভীর্যে বলল, সে আর বলবেন না দাদা। ডাক্তারবাবু তাঁর কোয়ার্টারে ঘুমোচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে তো আমাকে যাচ্ছেতাই করতে লাগলেন। প্রায় হাতে ধরে ঘর থেকে বের করা গেছে, এখন রুগীকে দেখছেন।'

নার্সটি তখনো মনীশকেই দেখছিল। এখনো যেন তার মন থেকে সন্দেহ ঘোচে নি। এদের কথাবার্তা শুনে, সে বলে উঠল, 'তবু তো দেখেছেন। হত কোন চাষী মজুর, এক হাঁকড়ানি দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতেন। বিকেল পাঁচটার আগে উনি হাসপাতালেই আসেন না।' নার্স কথাগুলো বলল প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে।

মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'কোন এমারজেন্সি কেস এলে ?

নার্স বলল, একই ব্যাপার। আপনি এমারজেন্স বললে তো হবে না। উনি যদি মনে করেন কেস্‌টা এমারজেন্সি, তা হলেই এমারজেন্সি।'

মনীশ বলল, 'অর্থাৎ রুগীর বাঁচা মরা, সবই ওঁর ইচ্ছা। ডাক্তার কেমন ?'

নার্স এবার গম্ভীর মুখে, চোখ বড় করে বলল, 'ডাক্তার খুব ভাল। তবে বয়স হয়ে গেছে তো।'

মনীশ বলল, 'সেই জন্যই।'

'সেই জন্যই মানে ?'

'মানে, বুড়ো বয়সে আর পেরে উঠছেন না।'

'তবে—।'

বলতে গিয়ে নার্স থেমে গেল। মনীশ চোখ তুলে, মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। নার্স আঙুল নেড়ে, টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলল, 'এই হলে, সবই পারেন।'

মনীশ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তবু আশা আছে। অন্ততঃ একটা মন্ত্রে ঠাকুর গলেন, নিরেট পাথর নন।'

তার বলার ভঙ্গিতে নার্স খিলখিল করে হেসে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে চুপ করল। তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

হাসপাতালের সীমানায়, সবুজ ঘাস গজানো অনেকখানি জায়গা সেখানে চারটে শালিক নিজেদের সঙ্গে, কী সব কথা কাটাকাটি করছে। তারপরে গুটিকয় বাবলাগাছ। সীমানা পেরিয়ে, ধানকাটা মাঠ। মাঠের ধূলায় চড়ুইয়েরা ধুলা-স্নান করছে। অনেক দূরে, গুটিকয় গাছ, তার নিচে গোরুর পাল চরছে।

মনীশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সুষমার মুখটা আবার

তার সামনে ভেসে উঠতেই, সে ঘরের পর্দার দিকে তাকাল। পর্দা সরিয়ে সে সময়েই ডাক্তারবাবু দেখা দিলেন। নার্সের উদ্দেশে তখনো বলছেন, 'সাত নম্বর বেড দিয়ে দাও, এখনো দু-একদিন দেরী আছে।'

মনীশ দেখল, চেক-কাটা লুঙ্গি পরা ডাক্তারবাবু, গায়ে একটি মোটা চাদর, পায়ে খড়ম। বয়স ষাটের কম নয়। মাথায় বেশ বড় একখানি টাক। রঙটা ফর্সা, চোখ মুখ একদা বেশ ভালই ছিল, এখন বার্ধক্যে চামড়ায় শৈথিল্য ও রেখার আধিক্য। যুবক স্বামীটি তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে, ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

ভারী মুখে, গম্ভীর গলায় বললেন, 'যেমন দেখবার, তেমনি দেখলাম। আপনাকে বললে আপনি কিছু বুঝবেন?

যুবক থতমত খেয়ে বলল, 'না. তা না, মানে ভাল তো?

যুবক আর কিছু বলতে সাহস পেল না। নার্স ঠোঁট টিপে হেসে, বউটিকে নিয়ে চলে গেল। মনীশকে যেন ডাক্তরবাবু দেখতেই পান নি। এভাবেই চলে যাচ্ছিলেন। মনীশ ডাকল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু ফিরে তাকালেন। মনীশকে একবার দেখে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?'

'একটু রুগী দেখতে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'এই গ্রামেই।'

'এখন যেতে পারব না।'

'একটু গেলে ভাল হত ডাক্তারবাবু, রুগী বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমি গেলেই রুগীর কষ্ট থেমে যাবে?'

মনীশ প্রায় আবেগ মিশিয়ে, করুণ স্বরে বলল, 'তাই তো যায়

ডাক্তারবাবু, আপনাদের দেখলেও রুগী ভরসা পায়, অর্ধেক রোগ সেরে যায়।'

ডাক্তারবাবু এবার ভাল করে মনীশকে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন 'কাদের বাড়ি থেকে আসা হচ্ছে?'

মনীশ ফড়িং-এর দিকে তাকাল। ফড়িং বলল, 'শিবনাথ মুখুজ্জে।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল, ডাক্তারবাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'ও বাড়িতে আমি আর যাব না। আমি হলাম, হেতুড়ে ডাক্তার, 'মুখুজ্জেদের বাড়িতে তো ফুলেরি থেকে ডাক্তার আনানো হয়। আবার এখানে কেন।'

মনীশ তার ওপরে যায়, বলল, 'ওসব ফুলেরি টুলেরি জানি না ডাক্তারবাবু, আপনি গাঁয়ের ডাক্তার, আমি আপনাকেই নিয়ে যাব। আমি এসেছি আমার বউদির জন্য, আমি তো মুখুজ্জেদের জন্য আসি নি। দয়া করে চলুন ডাক্তারবাবু, বউদি এখনো অজ্ঞান হয়ে আছেন।'

মনে হল ডাক্তারবাবু সন্তুষ্ট হলেন। মনীশকে আবার দেখলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'বউদি মানে, শিবনাথের বোন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু একটু ভাবলেন, বললেন, 'তোমার কথায় যাচ্ছি, বাপু, কিন্তু দশ টাকা ভিজিট দিতে হবে।'

মনীশ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'এ্যাডভান্স দিতে হবে?'

ডাক্তারবাবুর ভ্রূকুটি চোখে একটু সন্দেহ দেখা দিল। বললেন, 'এ্যাডভান্স কেন, রুগী দেখেই নেব।

মনীশ দেখল, কেঁচে যেতে পারে। হাত জোড় করে বলল, 'যা আপনার অভিরুচি।'

ডাক্তারবাবু প্রীত হলেন। বললেন, 'তোমার কথাবার্তা শুনেই

যাচ্ছি, না হলে যেতাম না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, আমি জামাকাপড় পরে আসছি।

তিনি কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। কোয়ার্টার দেখেই বোঝা যায়, বেশ সযত্নে লাউয়ের মাচা তুলেছেন। তার সঙ্গে সিম। কয়েকটি পেঁপেগাছে বেশ ডাগর ডাগর পেঁপের গুচ্ছ ঝুলছে। কঞ্চি বাঁশের বেড়া ঘিরে, অনেকখানি জায়গা দখল করে, তরকারির বাগান ছাড়াও গাঁদা আর অতসী ফুল ফুটিয়েছেন বিস্তর। কৃষ্ণকলির ঘন ঝাড়, কিন্তু তলা বেশ সাফ সুরত নিকানো।

ভাগ্য ভাল, ডাক্তারবাবু বেশী দেরী করলেন না। ধুতির নীচে সার্ট গুঁজে, কোট চাপিয়ে, শামলা মাথায় দিয়ে, সাইকেল নিয়ে এলেন। পিছনের কেরিয়ারে ব্যাগ। মনীশ বলল, 'ডাক্তারবাবু সাইকেলটা রেখে যান, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।'

ডাক্তারবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না বাপু, যতটুকু রাস্তাই হোক, গোরুর গাড়িতে আমি যেতে পারব না।'

ফড়িং বলে উঠল, 'গোরুর গাড়ি হবে কেন, মোটরগাড়ি।'

'মোটরগাড়ি!'

বোঝা গেল, ডাক্তারবাবু এতটা আশা করেন নি। মনীশ বলল, 'মানে, আমার দাদা ফুলেরিতে গাড়ি চালায় তো, সেই গাড়ি।'

'অ। ফকিরের গাড়ি?'

ডাক্তারবাবুর মুখে যেন একটু অশ্রদ্ধার ভাব ফুটল। কিন্তু আবার মনীশের আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'তুমি ফকিরের ভাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় থাক?'

'কলকাতায়।'

'সেই জন্যই।'

বলেই হাঁক দিলেন, 'ওরে অ গোবরা। গোবরা।'

কালো কুচকুচে, বেঁটে, হলদে চোখ, খাকী সার্ট-প্যান্ট পরা একজন মাঝবয়সী লোক কোথা থেকে আবির্ভূত হল। ডাক্তারবাবু তাকে বললেন, 'সাইকেলটা তুলে রাখ, বাক্সোটা খুলে দে।'

মনীশ নিজেই কেরিয়ার থেকে ওষুধের বাক্সটা হাতে নিয়ে নিল।

হাসপাতালের ডাক্তার আসতে বাড়ির আবহাওয়াটা হয়ে উঠল থমথমে। বিষয়ের গুরুত্ব যেন বেড়ে উঠল। ডাক্তার নাড়ি দেখে, ব্যাগ খুলে আগে একটা ইনজেকশন দিলেন, তারপরে সুষমার অসুখের বিস্তারিত খবর নিলেন। তাতে অনুমিত হল, সুষমার অসুখটা সকলেই টি. বি. বলে ধরে নিয়েছে। ডাক্তার জানতে চাইলেন বুকের প্লেট আছে কিনা। বর্ধমান টাউন থেকে একটা প্লেট করানো হয়েছিল। সেটা এনে ডাক্তারকে দেখানো হল। ডাক্তার দেখে বললেন, 'বুকে সেরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না।'

কিছুক্ষণ বাদেই সুষমার জ্ঞান হল। ডাক্তার সুষমার মাকে আরো কিছু প্রশ্ন করলেন। সুষমার পেটের ডান দিকে একটু চাপ দিতেই, সুষমা আর্তনাদ করে উঠল। ডাক্তারের মুখ ভীষণ গম্ভীর হল। তাড়াতাড়ি প্রেসক্রুপশান লিখে দিয়ে বললেন, 'এখুনি ওষুধ আনতে হবে। তবে এ ওষুধ হাসপাতালে নেই। ফুলেরিতেও পাওয়া যাবে না। বর্ধমান টাউন ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

কে যাবে ওষুধ আনতে? মনীশ বলল, 'আমিই যাব।'

ফকির বলল, 'না তুমি যাবে না, আমি যাব।'

'না তুমি থাক, আমি যাচ্ছি, আমি গাড়ি চালাতে পারি।'

ফকির অবাক হল, ফড়িং বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো বাবা, কাকা খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারে। হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল যে।' তথাপি সে নিজেই যেতে চাইল। মনীশ তাড়াতাড়ি অনেকগুলো টাকা বের করে বলল, 'এগুলো নিয়ে যাও।'

ফকির বলল, 'দরকার নেই, আমার কাছে একশো টাকার বেশী আছে।'

এদের ব্যাপার দেখে, বাড়ির সকলেই কেমন অবাক হল। মনীশের প্রতি তো বটেই ফকিরের প্রতিও যেন এ বাড়ির নতুন করে একটা কৌতূহল মিশ্রিত ঔৎসুক্য বেড়ে উঠল। ফকির যাবার আগে মনীশ তার কানে কানে বলল, 'দেখবেন দাদা; এটা যেন মিছিমিছি ভাববেন না।'

ফকির মুখটা বিকৃত করে বলল, 'তুমি আমার মাথাটা খাবে দেখছি।'

কিন্তু ফকিরের চোখে একটা ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ফুটে আছে। সে তাড়াতাড়ি প্রেসক্রপশন নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার সুষমাকে চিনি মিশিয়ে একটু ছানার জল দিতে বললেন। দুধ ঘি ইত্যাদি একদম বারন করলেন। বললেন, 'ছানার জলটা খেয়ে এখন একটু ঘুমোবে। তবে, একটু সাবধান। ওষুধটা তাড়াতাড়ি পড়া দরকার।'

ডাক্তার চলে যাবার সময়ে মনীশ আলাদা করে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কী?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার ঘোর সন্দেহ, লিভার অ্যাবসেস্ হয়েছে।'

'লিভার অ্যাবসেস্?'

'হ্যাঁ। অসময়ে খেয়ে, আর মাসে চৌদ্দটা উপোস স্বামী পুত্রের কল্যাণে, তার পরিণতি এসব। দেখছি তো এসব অঞ্চলে। যাই হোক, সেরকম বুঝলে খবর দেবে, আমি কোয়ার্টারে থাকব।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সুষমা ঘুমোচ্ছে।

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। মনীশ বুঝতে পারছে, তাকে নিয়ে সকলের কৌতূহল চরমে উঠেছে। সুষমা এবং ভাইয়েদের সামনে মনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে ফকিরের মাসতুতো ভাই। আপন নয়, একটু দূরের সম্পর্কের। কলকাতায় তাদের বাড়ি, বেড়াতে এসেছে। নেহাত কোন যোগাযোগ নেই, তাই আসা হত না। তারপরে ফকিরদার সঙ্গে এসে জানা গেল, বউদির শরীর খারাপ, দাদার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। সে জোর করে দাদাকে মন্দিরের গোড়ায় ধরে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু ফড়িংকে আলাদা ডেকে, নীলিমা সংবাদ পেল অন্যরকম। ওর কাছে ব্যাপারটা তাই রহস্যময় মনে হল। কিন্তু মনীশের দিকে তাকাতে গিয়ে বারে বারেই ওর মুখে লেগে গেল একটা রঙের ছটা, চোখে ঝিলিক। তারপরেই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

মনীশ দেখল, এ মুখ তার কলকাতার পরিবেশের মুখ নয়। তার জগতে যারা নক্ষত্রের মত বিচরণ করে, এ সে মেয়ে নয়। কিন্তু শুক্রস্থানের রাহুর যে মণ্ডলে তার বাস, সেখানে নিষ্পাপের কৌমার্য বিসর্জন যায় নি তা নয়। অতএব সাবধান। নীলিমা, তুমি দূরে থাকো। তাকে দেখে, মনীশের চোখের তারায় নিমেষ হারায়। প্রাণে একটা মুগ্ধতার আবেশ। কিন্তু দূরতর চাঁদের মত কিরণময়ী নীলিমা থাক আকাশে, দূরান্তের মত মনীশ থাক এক কোটাল লাগা নদীর মত। একজন কিরণ দিক, আর একজন জ্যোৎস্নায় ঝিকি-মিকি করুক।

ফড়িং মুড়ির পাত্র হাতে নিয়ে বলল, 'মাসী, কাকাকে জলখাবার দেবে না?'

মনীশের জলখাবারের দায়িত্ব, তুই বউদি এবং মা, নীলিমাকেই দিয়েছে। ওর দাদারা কিছুক্ষণ মনীশের সঙ্গে একটু আলাপ করছে।

দাদারা খুব আড়ষ্ট, কথার শেষে মুখে সমীহ। আশেপাশের বাড়ির লোকজনেরাও কেউ কেউ এসেছিল। সকলেরই মনীশকে নিয়ে কৌতূহল। মুখুজ্জেদের বড় জামাইয়ের এমন এক ভাই আছে, কেউ জানত না। কিন্তু মনীশ লক্ষ্য করল, নীলিমার দাদাদের একেবারেই ইচ্ছে নয়, বাইরের লোকেরা বাড়িতে ভীড় করুক।

নীলিমার হাতে জলখাবারের বহর দেখে মনীশ বলল, 'এক কাপ চা ছাড়া কিছুই চাই না।'

নীলিমা শুনতে চায় না। বলল, 'কলকাতা থেকে সেই কখন বেরিয়েছেন, খিদে পায়নি?'

'না তো।'

'মিছে কথা। একটু খান।'

মনীশ নীলিমার হাতের পাত্র থেকে একটি ছাপা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেল। সেই খাওয়া দেখে নীলিমার হাসি পেল। লজ্জা লাগল তার চেয়ে বেশী। মনীশ জল খেয়ে নিল। নীলিমা চা এনে দিল। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাঁধের ব্যাগটা এনে দেবেন?'

'দিচ্ছি।'

দারজার কাছে গিয়ে নীলিমা মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমাকে আপনি করে বলতে হবে না।'

একটু পরে সে বড় ব্যাগটা এনে দিল। তার ভিতর থেকে সিগারেট বের করে ধরাল মনীশ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় একটু ঘুরে আসা যায়? মানে বেড়িয়ে।'

নীলিমা অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন এই অচেনা গাঁয়ে অন্ধকারে? বাইরের বাড়িতে দাদারা আছে সেখানে যাবেন?'

মনীশ বলল, 'একলা থাকতে ইচ্ছে করছে।'

নীলিমা বলল, 'তা হলে ছাদে যান।'

'পথটা দেখিয়ে দাও।'

'আসুন।'

নীলিমা নিজেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদের দরজা খুলে দিল।

মনীশ ছাদে এসে চারদিকে অবারিত অন্ধকার ও আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'বাহ্ সুন্দর।'

নীলিমা ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার বলল, 'সত্যি আপনি ফকিরদার ভাই?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে ফুলেরিতে এসে একশো টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কেন? সব শুনেছি আমি।'

মনীশ পেছুবার লোক নয়। বলল, 'তখন তো পরিচয়টা জানাজানি হয় নি। হাসপাতালে এসে হল।'

নালিমা একটু চুপ করে রইল। অন্ধকারে ঠিক দেখা যায় না মনীশের মুখ। মনীশও ভাল দেখতে পাচ্ছে না নীলিমাকে। নালিমা বলল, 'ভারী আশ্চার্য তো।'

মনীশ বলল, 'পৃথিবীতে কত আশ্চার্য আছে।'

'তা বলে এতটা?'

বলে নীলিমা অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল। মনীশ দেখতে পেল না। ও ব্যাগটা কাঁধে করেই এসেছিল। তার ভিতর থেকে বের করল ছোট্ট একটা বিদেশী শক্তিশালী ট্রানজিস্টার। অন্ করে কলকাতায় দিল। বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত গায়িকার গান ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে কাছ থেকেই কথা শোনা গেল, 'কা ওটা?

নীলিমা কাছেই কোথায় ছিল অন্ধকরে। মনীশ চমকে উঠেছিল। বলল, 'ট্রানজিস্টর।'

'বাহ্!'

এক মুহূর্তের জন্য সে মনীশের কাছাকাছি হল, আবার কোথায়

অদৃশ্য হয়ে গেল। গানটা শেষ হল। মনীশ বন্ধ করল। সে চারিদিকে তাকিয়ে ডাকল, 'নীলিমা।'

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকল। কোন সাড়া নেই। শুধু নীলিমার মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে রইল। এমন দৃশ্য কবে দেখেছে মনীশ। গ্রামের মানুষের দু-একটা সাড়া শব্দ কোথাও শোনা যাচ্ছে। চারদিকে, গ্রামের বাইরে মাঠ। সেখানে মাঝে মধ্যে হঠাৎ এক-আধটা আলোর বিন্দু জেগে উঠে হারিয়ে যাচ্ছে। আশে পাশে গাছপালা বাঁশঝাড়। আকাশে তারার ঝিকমিকি। শীতটা যেন একটু বেশী লাগছে।

একটু পরে আবার শোনা গেল, 'একটা মাদুর আর আলো দিয়ে যাব?'

নীলিমা। মনীশ বলল, 'না, অন্ধকারই ভাল। তুমি কোথায়?'

'এই তো।'

'তুমি যেন রহস্যময়ী হয়ে গেলে।'

'কেন?'

'কাছে এস না।'

'কেন? কী হবে?'

'একটু কথা বলি।'

'আমাকে যখন সবাই খুঁজবে?'

নীলিমা তা হলে লুকিয়ে আসছে বারে বারে! মনীশ বলল, 'তাতে কী? চলে যাবে।'

'সবাই বুঝবে, আমি ঘুরে ফিরে খালি ছাদে আসছি।'

'এলেই বা, তাতে কি অন্যায় হবে?'

'বৌদিরা ঠাট্টা করবে।'

'কী বলবে?'

'তা কী জানি।'

মনীশ বুঝতে পারল, নীলিমার আসতে ইচ্ছা করছে, বৌদিদের ঠাট্টার ভয়ে আসতে পারছে না। ভয়টা আসলে লজ্জা।

এবার নীলিমা খুব কাছে এল। বলল, 'ওটা বাজাচ্ছেন না ?

'না, চুপচাপই ভাল লাগছে।'

'আপনার মুখটা খুব চেনা চেনা লাগে, কেন বলুন তো ?'

'তা তো জানি না। এরকম মুখ তো কতই আছে।'

'মিছে কথা।'

'কেন ?'

'এমন মুখ কতই আছে বুঝি ?,

'কেন থাকবে না। বরং তোমার মত মুখ কম আছে।'

'ছাই। ছাই। আপনি ভারি মিথ্যুক।'

মনীশ নিজেকে বলল, 'থাক,আর বেশী দূরে নয়। এখানেই থাক।'

এমন সমায় ফড়িং এসে ডাকল, 'মাসী মা তোমাকে ডাকছে।'

মনীশ বলল, 'বৌদি জেগেছে ?'

'হ্যাঁ।'

মনীশও নেমে এল। সুষমা তাকে দেখে ঘোমটা টেনে উঠে বসবার চেষ্টা করল। মনীশ বাধা দিয়ে বলল, 'উঠবেন না বৌদি, এ শরীরে উঠবেন না '

সুষমা আর উঠতে পারল না। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছেন ?'

'একটু ভাল। পেটে ব্যথাটা কম।'

নীলিমা ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মনীশকে নীরিক্ষণ করছে। তার সরল মুখে একটি মুগ্ধতার ছাপ পরিস্ফুট। ঘরের বাইরে, বাড়ির বউয়েরা যে রয়েছে, সেটাও অনুমান করা যায়।

খানিকক্ষণ পরে সুষমা আবার বলল, 'আশ্চার্য, আপনার কথা কখনো ওঁর মুখে শুনি নি।'

মনীশ বলল, 'কী করে শুনবেন, কোন যোগাযোগে তো ছিল না।'

একটু পরে মনীশ বলল, 'সব কথা শুনলাম ফকিরদার মুখে। আপনার মনে জোর আছে সত্যি।'

সুষমা বলল, 'মনের জোর আর কী, তবে আপনার দাদাকেও তেমন দোষ দিই না। ওকে এ বাড়িতে সত্যি বড় অপমানিত হতে হয়েছে।'

মনীশ বলল, 'এবার আর ওসব শুনছি না। দাদা আপনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।'

সুষমার চোখে জল এসে পড়ল। মনীশ শুনল, নীলিমা বলেছে 'লক্ষ্মণ দেবর এসেছে তো সঙ্গে, তাই।'

মনীশের মুখে এসে পড়েছিল, 'উর্মিলাকেও ছাড়ছি নে।' কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে চুপ করে গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফকির ওষুধ নিয়ে ফিরল। সুষমাকে ওষুধ দেওয়া হল। ফকির আড়ালে মনীশকে বলল, 'কী কাণ্ড যে করলে, আমার আবার একটু মাল খাবার নেশা আছে। এখন কোথায় পাব মাল ?'

মনীশের মনে পড়ে গেল, তার ব্যাগে একটা স্কচ বোতলে অর্ধেকের ওপরে হুইস্কি আছে। সে বলল, 'খাবেন ?'

'আছে ?'

'ব্যাগে আছে।'

'কী, বিলতি ?'

'হ্যাঁ।'

'তোফা, বলতে হয়, দাও বোতলটা দাও, কোথাও লুকিয়ে একটু মেরে আসি।'

'নীট ?'

'সে আবার কি ?'

'মানে জল ছাড়াই ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মাল যত কাঁচা হয়, ততই ভাল।'

মনীশ তাকে বোতল দিয়ে দিল। ফকির কোথা থেকে গিয়ে খেয়ে থেকে এল। এসে আবার মনীশকে বলল, 'একটু খাবে না ?'

মনীশের খুব ইচ্ছে করছিল। এ তো তার প্রতিদিনের জিনিস। কিন্তু আজ তো সেই প্রতিদিন নয়। অতএব থাক। বলল, 'না'।

দশ দিন হয়ে গেল। সুষমার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না, বরং খারাপের দিকেই। ফকির এর মধ্যে কয়েকবারই ফুলেরিতে যেতে চেয়েছে গাড়ি চালাবার জন্য। যেতে পারেনি। ফড়িংও তার মায়ের কাছে থাকতে পেরেই আশ্বস্ত। ফকির গাড়ি চালাতে যেতে চেয়েছে বটে, সুষমার কাছ থেকে নড়তে চায় নি বিশেষ। কেবল মাঝে মাঝে মনীশকে আড়ালে বলেছে, 'কী খেলা যে দেখাচ্ছ, জানি নে। মাথাটা তুমিই খাবে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, মনীশ দেখল, দূরতর চাঁদের জ্যোৎস্নায় মর্ত্যের নদীর তরঙ্গে যে ঢেউয়ের দোলা লাগল, মানব মানবী সম্পর্কে তার রূপটা আলাদা! মনীশ জীবনে মেয়ে দেখেছে অনেক। প্রেম, তাও বটে। কিন্তু প্রেমিকের নাম ছিল বিখ্যাত নায়ক সুজনকুমার। তার প্রেমিকারা সুজনকুমারের প্রেমিকা। নীলিমা বাতাস কাঁপা পাপড়ি যখন কাঁপে, তখন সে ফকির চাটুয্যে নামে ফুলেরির এক গাড়ির ড্রাইভারের ছোট ভাই। তাদের দেখা হয়, গ্রামের প্রান্তে, নাম-না-জানা এক ছোট নদীর ধারে। নাম-না-জানা, কারণ গ্রামের লোকেরাও তাকে শুধু নদীই বলে। কখনো কখনো বনের প্রান্তে। গোটা বাড়িটার যত নিরালা কোণে কোণে। মনীশ, ফড়িং আর নীলিমার দাদার দুই ছেলেকে সহ নীলিমাকে

নিয়ে ফকিরের গাড়ি করে বেড়াতেও বেরিয়েছে। নিজে একদিন বর্ধমান টাউনেও গিয়েছে ওষুধ আনতে।

এ কদিনেই, নীলিমার হাসতে গেলে, চোখে জল আসে। এ সেই বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত প্রেমেও প্রবন্ধের প্রেম নয়, বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। নীলিমা মরেছে। বাঁচেনি মনীশও। কিন্তু অন্তরের জগত ছেড়ে, নীলিমার সংসারের জগতে বেঁচে থাকাটা, এখনো অনেক বড়। অতএব, দূরে দূরে থাক মনীশ। তার নিশ্বাসের বাতাসে এখন অন্য একটা গন্ধ। দৃষ্টিতে একটা উজ্জ্বলতা। তা আর জীবনের চারপাশের সঙ্গে কোথাও মিল নেই।

একদিন ঘোর দুপুরে, ছাদে দাঁড়িয়ে, সিগারেট খেতে খেতে মনীশের চোখ পড়ল, নদী যেখানে বাঁকের মুখে, বাঁশঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে, হঠাৎ ওর মনে হল, ওখানে যেন কেমন একটা হাতছানির ডাক। ওদিকটায় কোনদিন ওর যাওয়া হয়নি। প্রায় কোন সময়েই একলা যাওয়া ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। ইচ্ছা হল, এই শীতের দুপুরেই নির্জনে একলা ঘুরে আসবে।

কথাটা মনে হতেই, ওর বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা দোলা লেগে গেল। যে দোলা লাগাটা জীবনে কোন একসময়ে, অন্য রকমের ছিল। যে-দোলা লাগাটা, বুকের রক্তে বহুকাল চলকে ওঠে নি। এ দোলা লাগাটা যে কিসের, তাও মনীশের ঠিক জানা নেই। ছোট এক নাম-না-জানা নদীর বাঁক, অনেক গাছপালা আর বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে যাওয়া সীমায়, বিশ্বের এমন কিছু অনাবিষ্কৃত রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে না, যার জন্য মানুষের বুকে দোলা লেগে যেতে পারে। তথাপি লাগে, মানুষেরই মন, এমন করেই কেন যেন দুলে ওঠে এবং বাঙলা দেশের মেয়ে পুরুষের প্রাণের নায়ক সুজনকুমারের ও উঠল। কলকাতার কথা ওর যেন তেমন করে আর মনে পড়ে না,

ভাবায় না। এখানে এসে এক অবগাহন স্নানের আবেশে ডুবে আছে।

অথচ, এখানে এই প্রকৃতির মন, পাখি পতঙ্গের মতো এই গ্রামের লোকেরা চোখ আর কান ভরে তুলছে না। নীচতা দীনতা হীনতা অনেক। নীলিমার কাছ থেকেই মনীশ খবর পায়, কত লোকে কত কা বলছে। বলছে মনীশকে কেন্দ্র করে, কটু কথা আর দুর্নাম রটছে মুখুজ্জে পরিবার সম্পর্কে। এত হীন কথা, ভাবা যায় না। গ্রামে রীতিমত ঘোঁট কুৎসিত আলোচনা। নীলিমার দাদাদের সঙ্গে কখন গ্রামের লোকের হাতাহাতি হয়ে যায়, বলা যায় না। আলোচনা পুকুর ঘাট থেকে টিউবওয়েলের চত্বরে বিস্তৃত। অথচ, ভরপেট খাবার বোধহয় অধিকাংশ লোকেরই ভাগ্যে ঘটে না। মনীশের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা, গ্রামে দুধ নেই, মাছ নেই, একটু ভাল তরিতরকারি নেই। ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে লরি ভরতি হয়ে, শহরের ফড়েদের মাথায় ঝাঁকায় সব কিছু চলে যায়। একদিক থেকে ভাবতে গেলে, সব যেন কেন নির্জীব, রিক্ত আর হতভাগা বলে মনে হয়।

তবু, এই সব কিছু ছাপিয়ে আরো কিছু আছে, যা মনীশের কাছে অবগাহন স্নানের মত। সে সব সম্ভবতঃ, এই গাছ পালা মাঠ নদী মন্দির পাখি পতঙ্গ এবং কিছু মানুষ। এমন মানুষও হয় তো অনেক আছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে যাদের চেনা যায় না। তারাও হয় তো ফকিরের মত, বাইরে থেকে দেখে যাকে প্রথমে মনে হয়েছিল, লোভী স্বার্থপর রাগী অশিক্ষিত নীরেট একটা পাড়াগেঁয়ে ঝরঝরে গাড়ির ড্রাইভার মাত্র। অথচ, সেই মানুষটার পশ্চাদ্‌পট আর ভিতর দেখলে আর এক মানুষকে দেখা যায়। অনেকটা যেন সেই বাউল গানটার মত, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে, ক্ষ্যাপা যারে খুঁজে মরছে।' সেই জন্য, গ্রামের লোকেরা কী বলছে, সেটা বড় কথা নয়। এমন একটা ঘটনা ঘটলে, দুটো কথা না বললেই বা চলে

কেমন করে। শহরে হলে এরকম, গ্রামে আর-এক রকম। তা ছাড়া সমালোচক যারা, তারা মুখুজ্জেদের সমকক্ষ, অনেকটা সমগোত্রের মানুষ, ঈর্ষা স্বাভাবিক। শহরে ঈর্ষা কম না, সম্ভবতঃ তার চেহারা আরো অনেক বেশী জটিল, অনেক শক্ত নিভাঁজ মুখোস পরা, অনেক তীব্র ও ভয়ংকর। কেবল গ্রামে খাদ্য নেই, এটাই সব থেকে নতুন অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মনীশের তাতে দুঃখ নেই। গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারের যে-টুকু শাক মাছ ভাত, সেটুকু তার কাছে অমৃতের মতই মনে হয়। লাঞ্চ ডিনার ড্রিংক ক্যাবারে গ্যাম্বলিং, কোন কিছুই মনে আসে না। সম্ভবতঃ একেবারে নতুন পরিবেশের জন্য এটা হতে পারে। ফকির, মনীশ, নীলিমার দাদারা যখন এক সঙ্গে খেতে বসে, বাড়ির গৃহিণী পরিবেশন করেন। দুই বউ শাশুড়িকে সব এগিয়ে দেয়, মুখের কিছুটা তাদের ঘোমটায় ঢাকা। গাছ-কোমর বাঁধা শাড়ি পরা নীলিমা তখন এক কোণে দাঁড়িয়ে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে মনীশকে দেখতে থাকে। চোখাচোখি হলে লজ্জা পায়। বৌদিদের দিকে তাকায়। সেখানেও যেন চোখেচোখে কী কথা হয়। নীলিমা হঠাৎ বৌদিদের কাউকে কী কারণে যেন জিভ ভেংচি দিয়ে, মুখ লাল করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। মনীশের তখন মোচার ঘণ্টর স্বাদের সঙ্গে আর-এক অনাস্বাদিত স্বাদে মনে তরঙ্গ লেগে যায়।

চুপ করে খানিকক্ষণ সেই নদীর বাঁকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, এক সময়ে সিঁড়ি দিয়ে সে নিচে নেমে গেল। নিঝুম বাড়ি, হয়তো সবাই ঘুমোচ্ছে। ফকির সুষমার ঘরে। সুষমার কাছে নিশ্চয় কেউ আছে। কিন্তু খুদেরা কি এত সহজে ঘুমোয়। ফড়িংই-বা কোথায়।

যেখানেই থাকুক, মনীশ সানগ্লাসটা চোখে লাগিয়ে উঠোনে নেমে এল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে, বাড়ির পিছন দিকের

খিড়কি পুকুরের পাশ দিয়ে নদীর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ছাদ থেকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, নিচের পথে তেমন নয়। নিচে বাগান বাবলা বন ডোবা পুকুরের আশপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে যেতে হয়।

মনীশ নদীর ধারে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেল। নদীর ধারে এপারে-ওপারে চাষ আছে। বাগানও আছে। বাগানের মধ্যে কলাবাগানই বেশী। চাষের মধ্যে রবিশস্য, কলাই মুগ মটর আলু। দু একটা পানের বরজ। এমন ঘোর দুপুরে, নদীতে মাঠে, কেউ নেই। মনীশ এগিয়ে গেল। বাঁশঝাড়ের কাছে এসে, নদীটা সত্যি এমন করে মোড় নিয়েছে ডান দিকে, কিছুই দেখা যায় না। বাঁশঝাড় নিচু হয়ে ছপ ছপ করে জলে লাগছে।

মনীশ চোখ তুলে দেখল, বাঁশঝাড়ের উঁচু জমিতে পায়ে হাঁটা রাস্তা উঠে গিয়েছে, দু পাশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সেই পথ দিয়ে উঠে বিস্তৃত বাঁশঝাড় পেরিয়ে হঠাৎ দেখল, একটা বাঁশের সাঁকো। নদীর ওপরে গাছপালায় নিবিড়। তার মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়া।

মনীশের মনটা নেচে উঠল। কিসের মন্দির, কেমন মন্দির, দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁকোর ওপর উঠল। উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল সাঁকোটা মড়মড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুলে গেল। এখুনি ভেঙে পড়বে যেন। অথচ হাত বাড়িয়ে ধরার কিছু নেই। রীতিমত সার্কাসের রজ্জু খেলা। যদিও সাঁকোটা তত সরু নয়। প্রায় দেড় হাত চওড়া ফালি ফালি বাঁশের ওপরে। ঘিঞ্জি করে মোটা কঞ্চি পাতা। তলায় কাঠের খুঁটি।

হয়তো একদা সাঁকো পোক্ত ছিল এখন নড়বড়িয়ে ঝরঝরিয়ে গিয়েছে। বাঁশে ঘূণ, কঞ্চিতে পোকা, খুঁটিতে ক্ষয়, মনে হয়

পরিত্যক্ত। কিন্তু সাঁকোর মাঝখানে মানুষের পায়ে পায়ে যে দাগ পড়েছে তা পুরনো নয়।

মনীশ প্রথম দোলানিটা একটু সামলে আবার আস্তে আস্তে পা বাড়াল। পড়লে, জলে! তাতে বিশেষ অসুবিধা নেই, সাঁকোটা ঘাড়ের ওপর না পড়লেই বাঁচোয়া। দেখা গেল আস্তে গেলে দোলানি কম, টিপে টিপে পা ফেললে মড়মড় শব্দটা তেমন ভীতিজনক ভাবে বাজে না। মনীশ তেমনি করেই সাঁকোটা পার হয়ে গেল। এক পথ গিয়েছে সোজা আর এক পথ ডাইনে নিবিড় গাছপালার মধ্যে। মন্দিরটা সেদিকেই। মনীশ সেই পথেই গেল।

কিছুটা যাবার পরে, দেখতে পেল, বাঙলা দেশের শীতের ফুল আর লাউ সিম মাচা তোলা, ঘেরা ঘেরা বাগান। দুটি বেড়ার ঘর, মাথায় খড়ের চাল। তার পাশে এক প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের উঠোনটার সামনে কেউ ঝাঁটা দিয়ে শুকনো পাতার ডাঁই আশেপাশে সরিয়ে রেখেছে। চার পাশে বড় বড় গাছ। লোকজন কেউ কোথাও নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ।

মনীশ পায়ে পায়ে মন্দিরের সামনে গেল। মন্দিরের গায়ে, পোড়াইটের কাজ। বিচিত্র নারী পুরুষের মূর্তির ছাপ তার গায়ে। এই সব মূর্তির কী পরিচয়, মনীশ জানে না। কিন্তু তাদের শরীরের পোশাক অলঙ্কারভঙ্গি সুন্দর লাগে। অনেক জায়গাতেই ভেঙে পড়েছে। ইটে নোনা ধরেছে। এখানে যেন বড় বেশী ঠাণ্ডা।

মনীশ মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিতেই, উঠোনের দিকে, শুকনো পাতার, কার যেন পায়ে হাঁটার শব্দ পাওয়া গেল। মনীশ থমকে গেল। পিছন ফিরে তাকাল, কাউতে দেখতে পেল না। আবার সিঁড়িতে পা দিতে গেল, আবার শব্দ হল। যেন দু পা দৌড়ে গেল কেউ। পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই। সুজনকুমারের একটু যেন

অস্বস্তি হল। একটু ছমছমানিও। এমন নির্জনে এরকম একলা। সহসা যেন নিজেকে একটু অসহায় বোধ হল। ভৌতিক কিছু না হোক কোন জন্তুজানোয়ার হতে পারে। দুষ্টু লোকেরই বা অভাব কী

মনীশ মন্দিরের চত্বরে সরে এল, চারপাশে তাকাল। একটানা ঝিঁ ঝিঁ আর থেকে থেকে পাখির পিক্ পিক্ ছাড়া কোন শব্দ নেই এখন। আবার হঠাৎ মনীশের পিছন দিকে শুকনো পাতার শব্দ হল। ও তাড়াতাড়ি পিছন ফিরল। কেউ নেই। এ বড় অস্বস্তি। ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

মনীশ ঘুরে চলতে আরম্ভ করবার আগেই আবার শুকনো পাতার শব্দ এবং এবার শব্দ লক্ষ্য করে ফিরতে গিয়েই একটা যেন কা দেখতে পেল। রঙিন কিছু। কিন্তু মস্ত চওড়া একটা গাছের আড়ালে চকিতে তা সরে গেল। মনীশ বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

কোন সাড়া শব্দ নেই। একটা ভয় মেশানো দ্বিধা থাকলেও, মনীশ পায়ে পায়ে সেই গাছের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সন্দেহ, কোন মানুষ আছে ওখানে। তবু গাছটার কাছে গিয়ে, ও থমকে দাঁড়াল। ওপাশে কে আছে, কী আছে সঠিক জানে না। আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে?'

হঠাৎ একটু হাসির শব্দ শোনা গেল যেন। চকিতে একটা সন্দেহের ঝিলিক হেনে গেল মনীশের মনে। গাছের ওপাশে গেল দেখল এক রাশ খোলা রুক্ষু চুল, খয়েরি রঙের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকা। হাসির চমকে শরীর কাঁপছে। নীলিমা, কোন সন্দেহ নেই।

মনীশ মুখে চেপে রাখা আঁচল ধরে টান দিতেই নীলিমার মুখ দেখা গেল। হাসিতে আর লজ্জায় সেই মুখ লাল। নীলিমা আজ মাথা ঘষেছে, তাই খোলা চুল ফাঁপানো, ছড়ানো। কালো চুলের

মাঝখানে তার লাল হয়ে ওঠা মুখ। চকিতে একবার মনীশের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

মনীশ তখনো নীলিমার আঁচল ছাড়ে নি। বরং আঁচল টেনে, নীলিমাকে টেনে নিল একেবারে বুকের কাছে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরল। বলল, 'ভীষণ ভয় দেখিয়েছ তুমি। আমি পালাচ্ছিলাম।'

নীলিমা আবার হেসে উঠল। মুখ নামিয়ে নিল। মনীশ আঁচল ছেড়ে নীলিমার কাঁধে হাত রেখে আবার চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখ তুলে ধরল। নীলিমা রক্তিম মুখে মনীশের দিকে দেখল, আর মুহূর্তে ওর চোখ দুটি বুজে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ভয় দেখানো কৌতুকের লজ্জা মেশানো হাসিটা যেন অন্য রূপ নিল। মনীশ দেখল সেই দূরতর চাঁদ কোটাল লাগা নদীর বুকে দোলে। একটি সুন্দর মুখ, বুকের কাছে, সুজনকুমারের পক্ষে খুব আয়াসসাধ্য কখনো নয়। কিন্তু এক দূর গ্রামের নিবিড় গাছপালা ছাওয়া মন্দিরের নির্জন চত্বরে নীলিমার মুখ মনীশের কাছে আর এক মায়া। একটি কাছের মুখে, মুখের ওপরে নিশ্বাস ফেলে কোনদিন যেন বুকের মধ্যে এমন দুরু দুরু করে ওঠে নি। দূরে রাখতে চেয়েও নীলিমাকে আরো কাছে টেনে মনীশ নীলিমার ঠোঁটে চুমো খেল।

তথাপি নীলিমা চোখ খুলতে পারল না, ওর শরীরে যেন একটা অচিন চেতন একবার কাঁপিয়ে দিল। মনীশ হাত দিয়ে রুক্ষু চুলের গোছা সরিয়ে দিল নীলিমার মুখ থেকে, আবার চুমো খেল, আগ্রাসী আবেগে গভীর আলিঙ্গনে। প্রত্যাশা করল, নীলিমা গ্রহণের সংকেত গ্রহণ করে দেবে। কিন্তু বোঝা গেল নীলিমা তা জানে না। ও শুধু জানে দান। তারপরে মনীশের কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে মুখ, মুখ যেন ভার। আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছল। তারপরে ঘাড় ফিরিয়ে মনীশের দিকে তাকাল।

মনীশ বুঝতে পারল না, নীলিমা দুঃখিত হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে, না রাগ করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলে?'

নীলিমা ঘাড় নেড়ে সায় দিল, তারপরে চোখে ঝিলিক হানল। ফিক করে হাসল। রক্তিম জিভ বের করে ভেংচে দিয়ে, শুকনো পাতার ওপর দিলে ছুটে গেল অন্য দিকে। মনীশের মনে হল ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা তরঙ্গে টলটল করছে। ঝড় তোলপাড় নয়। ও নীলিমাকে অনুসরণ করল।

নীলিমা যেদিকটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, নদী সেই দিকে। বাঁয়ের কিছু গাছপালা ছড়িয়ে, ধান কাটা মাঠ ধু ধু করছে। মনীশ ডাকল, 'নীলিমা'।

নীলিমা মুখ ফিরিয়ে হাসল। লজ্জার ছায়া ওর মুখ থেকে যায় নি, তবু সহজভাবে জিজ্ঞেস করল, পালিয়ে এসেছিলেন কেন?'

'পালাব কেন। ছাদে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল, নদীর ধারের এদিকটায় একটু দেখতে আসি। ভাবলাম তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'দিনের বেলা আমি ঘুমোই না।'

মনীশ বলল, 'জানলে পরে ডেকে নিয়ে আসতাম।'

নীলিমার চোখে ভয় মেশানো বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'শুধু আমাকে?'

'কেন, তাতে কী?'

'ছি ছি, সবাই তা হলে কী ভাবত। একলা কখনো আসা যায় বুঝি। ছোটর দল সঙ্গে যাবে, তাই আসতে পারি।'

'তবে যে তুমি এখন একলা এলে?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, মুখ

নামিয়ে নিল নীলিমা। মনীশ আরো কাছে গেল। বলল, 'পালিয়ে এসেছ বুঝি ?'

নীলিমা বলল, 'দেখতে এসেছিলাম, কোথায় যাচ্ছেন। কে জানত এত দূরে আসবেন।'

বলতে বলতেই নীলিমা আঁচল চেপে হেসে উঠল। মনীশ বলল, 'হাসছ যে।'

নীলিমা বলল, 'সাঁকোয় উঠে কী রকম ভয় পেয়েছিলেন ?'

'সেটাও তুমি দেখেছ ?'

'আমি তো তখন বাঁশঝাড়ের আড়ালে।'

'পিছু নিয়েছিলে বুঝি ?'

নীলিমা হাসল।

মনীশ বলল, 'কিন্তু সাঁকোটা তো ভয় পাবার মতই।'

নীলিমা বলল, 'আমরা তো ওটার ওপর দিয়ে দৌড়ে পার হই।'

মিথ্যে বলবার মেয়ে নয় নীলিমা ; খোলা চুল, এলো আঁচল, স্বাস্থ্যবতী নীলিমা। ওর ফর্সা ডাগর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মনীশ কথা হারাল। তৃষ্ণার্ত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নীলিমার ভুরু নতিয়ে উঠল, চোখে যেন ভৎর্সনা। তারপরেই মুখে যেন গভীর ছায়া নেমে এল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী দেখছেন ?'

'তোমাকে।'

'আমাকে দেখার কী আছে।'

'ভাল লাগছে।'

'মিছিমিছি।'

কথাটা শুনে মনীশের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ও হাত বাড়িয়ে নীলিমার হাত ধরল। বলল, 'মিথ্যে নয় নীলিমা।'

নীলিমার ছায়া মুখে আলোর ছটা লাগল একটু, তবু ছায়ার

ভাব বেশী। একবার মনীশের দিকে তাকাল, তারপরে নদীর জলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কবে চলে যাবেন?'

মনীশ বুঝতে পারছে, নীলিমার মনে অনেক জিজ্ঞাসা। কথাটার জবাব দিতে একটু যেন দেরী হল। বলল, 'এখনো ঠিক নেই। বৌদি সেরে উঠুন।'

'বৌদি সেরে উঠলে?'

'দাদার বাড়িতে।'

'সেখান থেকে? নিজেদের বাড়িতে?'

মনীশ যেন অনেক অসহায় হয়ে বলল, 'আর কোথায় যাব নীলিমা?'

নীলিমা আবার তাকাল মনীষের দিকে। বলল, 'তাই তো। সেখানে সবাই আছে।'

মনীশ বলল, 'হ্যাঁ, চাকর-বাকর আছে।'

নীলিমা অবাক চোখে তাকাল।

মনীশ বলল, 'আর তো কেউ নেই।'

'কেন?'

মনীশ হেসে বলল, 'কেন আবার, নেই, তাই।'

নীলিমা যেন বিশ্বাস করবে কি করবে না, বুঝে উঠতে পারছে না। বলল, 'আপনার সবই আশ্চর্য।'

মনীশ নীলিমার গলায় হাত দিয়ে কাছে টানল। নীলিমা ভয়ের স্বরে বলল, 'কেউ দেখবে।'

মনীশ তৎক্ষণে নীলিমার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামিয়ে দিয়েছে। সে মুখ তুলতে নীলিমা একটু সরে গেল। এদিক ওদিক তাকাল। বলল, 'আমি যাই। আমি আগে সাঁকোটা পেরিয়ে যাই, আপনি আরো পরে আসবেন। আর কোথাও নয়, বাড়িতে আসবেন।

বলে ও ছুট দিল। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাগ হয় নি তো ?'

মনীশ ঘাড় নেড়ে, নিঃশব্দে জানাল, না। নীলিমা মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'মন্দিরের পিছনে একটা বেলগাছ আছে। গাছের ডালে কিছু মানত করে, ঢিল বেঁধে দিলে মনোস্কামনা পোরে।' বলেই তেমনি ছুটে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

আর মনীশ যেন সাপের মত, দংশনে বিষ ত্যাগ করে, কেমন একটা ব্যথায় নির্জীবের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ওর অভিনয় নয়, এইটাই ব্যথা। নিঃশ্বাস ফেলে মন্দিরের পিছনে সেই বেলগাছের সন্ধানে গেল ও।

মন্দিরের পিছনে বেশ ঝাড়ালো বেলগাছ। তাতে অজস্র ঢিল ঝুলছে। হাত বাড়ালেই ডাল পাওয়া যায়। এমন বেলগাছ যেন অশেষ কৃপা। কষ্ট করে কাউকে পাতা পাড়তে হয় না।

ও দেখল, অনেক ছোটখাটো ঢিল পড়ে নেই শুধু, অনেক পাড়ের দড়ি এখানে-সেখানে ছড়ানো। মনীশ ঢিল তুলে, দড়িতে বাঁধল। তারপর ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বারে বারেই ভাবতে লাগল, 'আমার কী মনোস্কামনা, কী কী কী।'...

বাঁধা শেষ হয়ে গেল, তবু কোন প্রার্থনা ফুটে উঠল না ওর মনে। কেবল একটা কষ্টের অনুভূতি আর নীলিমার মুখটা বারে বারে মনে পড়তে লাগল।

দশ দিন পরে, হাসপাতালের ডাক্তার বলল, অপারেশন ছাড়া বোধহয় উপায় নেই। বাঁচানো কঠিন। তবে অন্য একজন ডাক্তার দেখাতে পারলে ভাল হয়, আরো কোন বড় ডাক্তার। মনীশ সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে। কলকাতায় তার নিজস্ব ফিজিশিয়ান-কে সে তার লেটারপ্যাডে চিঠি লিখল। 'পত্রবাহককে কিছু জিজ্ঞেস

করবার দরকার নেই। সঙ্গে চলে আসবেন, ঠিকানা নিচে লিখে দিলাম। কলকাতা থেকে দূরত্ব সত্তর-আশী মাইলের বেশী নয়। শুধু একটা অনুরোধ, কাউকে এ কথা বলবেন না। আপনার গাড়ি নিয়ে আসাই ভাল। জি. টি. রোড থেকে আট মাইল কাঁচা রাস্তা যদিও, তা হলেও অসুবিধা হবে না। আপনি বলেই আমি কোন টাকা পাঠালাম না।'

ফকির নিজে গেল সেই চিঠি নিয়ে। ডাক্তার চিঠি পড়ে অবাক হয়ে ফকিরকে দেখলেন। যাবার পথঘাট ঠিকানা আরো ভালো করে জেনে নিলেন। তারপর ভিতরে গিয়ে আধঘণ্টা বাদে বেরিয়ে এলেন পোশাক পরে। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে চললেন।

ফকির ভাবল, কী যে করেছে এই মনীশ ছোকরা! কেন যে আবার সুষমাকে দেখলাম!···

মনীশের ডাক্তার যখন জবাগ্রামে এসে পৌঁছুলেন, তখন সুষমার অবস্থা একেবারেই খারাপ। তিনি তো মনীশকে দেখে যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না, সে এখানে! যাই হোক, রুগী দেখে তিনি বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না, এখন আর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এ রুগীকে লিভার অপারেশন করা যাবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই, ফকিরের কোলের ওপরে সুষমা, ঘর ভরতি লোকের সামনে মারা গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে-ই তার শেষ অচৈতন্য

অবস্থা। তার জ্ঞান ফিরে আসে নি। ফকিরকে তখন দেখাচ্ছিল, এক মুখ দাড়ি, চোখমুখ বসে যাওয়া নিতান্ত অসহায় একটা লোক। প্রথম মৃত্যু ঘোষণার পরে সে কেবল বলল, 'নিজের মানুষকে দূরে ফেলে রাখলে এরকমই হয়।'

তারপরে মনীশের দিকে ফিরে বলল, 'কেন এসেছিলে জবা-গ্রামে। এও কি মিছিমিছি?'...

অভিনয় করে তো চোখে জল অনেক এনেছে মনীশ, কিন্তু এমন বুক টনটনিয়ে ওঠা কষ্ট কোন কথায় আগে অনুভব করে নি।

প্রায় শেষ রাত্রে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে সুষমাকে দাহ করা হল। ইতিমধ্যে ডাক্তারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা মনীশের হয়েছে। ডাক্তারকে সে জানিয়েছে, ফকির তার দাদা, এখানে না জানিয়ে এসেছিল, যাতে তার জগতের লোকেরা এখানে কেউ না আসে।

সকালবেলা, প্রায় দশটা নগাদ, ডাক্তার যখন কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করছে, তখন জবাগ্রামে এসে পৌঁছুল আরো তিনটে গাড়ি। তারা সারি সারি এসে দাঁড়াল মুখুজ্জ্যেবাড়ির সামনে। খবর পেয়েই মনীশ ডাক্তারের দিকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। ডাক্তার বলল, 'কী করব বল, যে ভাবে তোমাকে খোঁজাখুঁজি চলছে, তোমার সেক্রেটারিকে একটা টেলিফোন না করে আমি পারি নি।'

তিনটি গাড়ির মধ্যে সুজনকুমারের বিখ্যাত বিদেশী বিশাল গাড়িটা দেখার জন্যেই গ্রামটা ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে কলকাতার

অভিনয় জগতের নারী পুরুষ। বিশেষ ভাবে, একজন খ্যাতনাম্নী নায়িকা পর্যন্ত জবাগ্রামে এসে পড়েছে।

মৃত্যুর শোকে তখনো বাড়িটা থম্ থম্ করছে। তথাপি, একটা কৌতূহল সকলেরই। কেবল মনীশ দেখতে পেল না নীলিমাকে।

ফকির বলল, 'ভালই হয়েছে. আমিও আমার ছেলেকে নিয়ে এখুনি জবাগ্রাম থেকে কাটব।'

মনীশ খুঁজতে খুঁজতে নীলিমাকে এসে পেল দোতলার এক ঘরে। একটা খাটে সে পাষাণ প্রতিমার মত বসেছিল। মনীশ আসতে উঠে দাঁড়াল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। নীলিমা ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'তুমি সেই নায়ক?'

মনীশ বলল, 'আমি মনীশ।'

নীলিমা মাথা নাড়ল, 'তুমি নায়ক। এখুনি চলে যাচ্ছ?'

মনীশ নীলিমার এমন নির্বিকার প্রাণহীন কথায় অবাক হল। বলল, 'যাওয়াই তো ভাল।'

নীলিমা বলল, 'আচ্ছা।'

মনীশ হয়তো তার জগতের সীমা ছাড়িয়ে এ কথা বুঝতে পারল না, নারীর জীবনে বহু বিচিত্র আঘাতের প্রথম আঘাতে নীলিমা বিশ্বসংসারে বিচিত্র রূপ দেখে, এই প্রথম থমকে দাঁড়িয়েছে। রাত্রে দিদি মারা গিয়েছে. সকালে মনীশ চলে যাচ্ছে। এই বাস্তবের অপ্রাকৃত রূপ। এ স্তব্ধতা না কাটলে, নীলিমা নিজেও জানতে পারছে না, তার কোথায় কী ঘটছে। তথাপি, মনীশ ঘর ছাড়বার আগেই নীলিমার চোখে জল এসে পড়ল।

জবাগ্রামের বুকের ওপর দিয়ে সারি সারি পাঁচটা মোটর গাড়ি চলল। যেন একটা মিছিল, বিচিত্র যাত্রী নারী পুরুষ। সকলের

শেষ গাড়িটা ফকিরের, যেমন তার শব্দ, তত তার লাফানো। সেই গাড়িতে ফকির, ফড়িং এবং মনীশও। মনীশ সকলের কাছে যথারীতি বিদায় নিয়েছে। নীলিমাকে আর দেখতে পায় নি।

গাড়ি ছেড়ে দেবার সময় সে অনেক চেষ্টা করেছে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে যদি নীলিমাকে দেখা যায়। দেখা যায় নি।

নীলিমা ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে, মাঠের রাস্তার ওধার দিয়ে সেই গাড়ির সারি দেখছিল। কে জানে কোন গাড়িতে মনীশ আছে। কিন্তু তার চোখ ঝপসা হয়ে এল।

মনীশের মনে হল, মাঠের ধুলোয় তার চোখ ঝাপসা। চোখের সামনে নীলিমার মুখটা ভাসছে। মনে মনে বলল, এ ত আর একটা নাটকই হয়তো হল। আসলে আমি যা, আবার সেখানেই চলেছি। কিন্তু এখানেও কি অভিনয় করে গেলাম?

জবাগ্রামের মাঠে ধুলো উড়ছে।

ফকিরের চোখের সামনেও শুধু সুষমার মুখখানি ভাসছে

ফড়িং-এর চোখে, তার মায়ের।